অন্তরের আমল: দ্বীনদারি

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

অনুবাদ: জাকের উল্লাহ আবুল খায়ের

সম্পাদনা: ড. মোঃ আবদুল কাদের

2012 - 1433

IslamHouse.com

﴿ أعمال القلوب: الورع ﴾

« باللغة البنغالية »

الشيخ محمد صالح المنجد

ترجمة: ذاكر الله أبو الخير

مراجعة: محمد عبد القادر

2012 - 1433

IslamHouse.com

ভূমিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

যাবতীয় প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনের যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক। আর সালাত ও সালাম নাযিল হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর, যিনি সমস্ত নবীগণের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ। আরও সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার পরিবার, পরিজন ও সাথী-সঙ্গীদের উপর।

অন্তরের আমলসমূহের অন্যতম আমল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি। পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, দ্বীনের খুঁটিসমূহ তথা ভিত্তিসমূহের একটি অন্যতম ভিত্তি ও খুটি। তাকওয়া, পরহেজগারি ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভয় ছাড়া ঈমানদারি চলে না। মনে রাখতে হবে, দ্বীনদারি মানবাত্মা ও অন্তরকে যাবতীয় নাপাকী-অপবিত্রতা থেকে পবিত্র করে এবং বিভিন্ন ধরনের মানবিক ব্যাধি-হিংসা, বিদ্বেষ, পরশ্রিকাতরাতা ইত্যাদি হতে মুক্ত করে। পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, ঈমানী বৃক্ষের ফল এবং ঈমানের সৌন্দর্য। দ্বীনদারি ছাড়া ঈমান, ফল ছাড়া বৃক্ষের মত। ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য দ্বীনদারি আবশ্যক। তবে দ্বীনদারি কি তা আমাদের অবশ্যই জানা থাকতে হবে। আমরা অনেকেই পরহেজগারি ও দ্বীনদারি কি তা জানি না। এ জন্য পরহেজগারি ও দ্বীনদারি সম্পর্কে আলোচনা খুবই জরুরি। যাতে আমরা কোনটি দ্বীনদারি আর কোন গোড়ামি তা জানতে ও বুঝতে পারি।

আমরা এ কিতাবে দ্বীনদারি- ورع- এর সংজ্ঞা, হাকীকত, উপকারিতা ও ফলাফল ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। সাথে সাথে এখানে থাকবে কিভাবে আমরা দ্বীনদারি অর্জন করতে পারি তার আলোচনা, মুত্তাকী ও পরহেজগার হিসাবে আমরা নিজেকে কিভাবে গড়ে তুলতে পারি তার আলোচনা। আর আমার এ রিসালাটি, অন্তরের আমলসমূহের ধারাবাহিক আলোচনারই একটি অংশ বিশেষ। একটি ইলমী প্রশিক্ষণ সেন্টারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে আলোচনা করার সুযোগ দিয়েছিলেন, তখন আমি এ বিষয়টির উপর আলোচনা করি। আমার আলোচনাটিকে রিসালা-পুস্তিকা- আকারে রূপ দেয়া হয়। আমার সাথে কিছু আহলে ইলম সাথী ছিল, যারা আমাকে বিভিন্নভাবে এ বিষয়ে সহযোগিতা করেন।

আমরা তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট কামনা করি, তিনি যেন তাদের ও আমাদের সবার জন্য যাবতীয় কল্যাণ ও কামিয়াবিকে সহজ করে দেন এবং ইলম ও আমলের পথকে উন্মুক্ত করে দেন। নিশ্চয় তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং কবুল করেন। আমীন।

মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জেদ

বিষয়ের গুরুত্ব

আল্লামা তাউস রহ. বলেন, ঈমানের দৃষ্টান্ত হল, বৃক্ষের মত, তার মূল, কাণ্ড ও ডাল-পালা হল, এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাসূল। আর ঈমান বৃক্ষের ফল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি। যে বৃক্ষের ফল নাই তার মধ্যে কোন উপকারিতা নাই। আর যে লোকের মধ্যে দ্বীনদারি নাই তার মধ্যে কোন কল্যাণ নাই[1]।

কাসেম ইবনে উসমান রহ. বলেন, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, দ্বীনের খুঁটি[2]। আরো মনে রাখতে হবে, আসল ইবাদতই হল, দ্বীনদারি অর্জন করা। হারেস ইবন আসাদ আল-মুহাসেবী রহ. বলেন, আসল ইবাদত হল, দ্বীনদারি। কাসেম আল-জুয়ী রহ. বলেন, দ্বীনের মূল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা। দ্বীনদারি হল একজন বান্দার যোগ্যতার আসল প্রমাণ[3]। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তারা উভয়ে বলেন,

« لا تنظروا إلى صلاة أحد ولا صيامه، وانظروا إلى صدق حديثه إذا حدث، وإلى أمانته إذا ائتمن، وإلى ورعه إذا أشفى»

"তোমরা কোন মানুষের সালাত ও সাওমের দিকে দেখে তার দ্বীনদারি বিচার করবে না। যখন সে কথা বলে তখন সত্য বলে কিনা তা দেখবে,

---

[1] আব্দুল্লাহ ইবন আহমদের আসসুন্নাহ: ৬৩৫।

[2] তারিখে দামেশক: ৪৯/১২২।

[3] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১০/৭৬।

যখন তার নিকট আমানত রাখা হয়, তখন তার আমানতদারিতার প্রতি লক্ষ্য করবে এবং যখন অসুস্থ হয়, তখন তার দ্বীনদারির প্রতি লক্ষ্য করবে”[4]।

সালফে সালেহীনগণ দ্বীনদারি কিভাবে অর্জন করতে হয়, তা শিখতো। আল্লামা জাহহাক রহ. বলেন,

“আমাদের যুগে আমরা দ্বীনদারি শিখতাম। তিনি আরও বলেন, আমরা আমাদের সাথীদের দেখতাম তারা কিভাবে দ্বীনদারি অর্জন করা যায় তা শিখতো”।

দ্বীনদারির সংজ্ঞা:

আভিধানিক অর্থ: অভিধানে এর অর্থ হল, সংকোচ বোধ করা।

কিন্তু শব্দটির মূল অর্থ হল, হারাম থেকে বিরত থাকা, তারপর শব্দটিকে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হলে, তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মুবাহ ও হালাল বস্তু থেকে বিরত থাকা[5]।

পারিভাষিক অর্থ:

শব্দটি পারিভাষিক অর্থ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

---

[4] শুয়াবুল ঈমান: ৫২৮১, ৫২৭৮।

[5] লিসানুল আরব: ৩৮৮/৮।

আল্লামা ফুজাইল ইবনে আয়াজ রহ. বলেন,

الورع: اجتناب المحارم

"الورع তথা দ্বীনদারি হল, নিষিদ্ধ বিষয় হতে বিরত থাকা"[6]।

আল্লামা ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ. বলেন,

الورع: ترك كل شبهة، وترك ما لا يعنيك، وترك الفضلات

"পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, সন্দেহযুক্ত বস্তু, অনর্থক কর্মকাণ্ড ও অতিরঞ্জিত কোন কাজ করা হতে বিরত থাকা"।[7]

আল্লামা ইবনুল কাইয়্যেম দ্বীনদারির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন,

الورع: ترك ما يُخشى ضرره في الآخرة

"দ্বীনদারি হল, যে কাজ করলে আখিরাতের ক্ষতির আশংকা রয়েছে, তা পরিহার করা"[8]।

আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আলী আল কাতানী রহ. বলেন,

الورع: هو ملازمة الأدب، وصيانة النفس

---

[6] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৯১/৮।

[7] মাদারেজুস সালেকীন ২১/২.

[8] আল-ফাওয়ায়েদ: ১১৮.

“দ্বীনদারি হল, শিষ্টাচারিতা অবলম্বন করা এবং আত্মার হেফাজত করা”[9]।

আল্লামা যুরকানী রহ. বলেন,

الورع: ترك ما لا بأس به حذراً من الوقوع مما به بأس

“দ্বীনদারি হল, যাতে কোন ক্ষতি নাই তা ছেড়ে দেয়া যাতে যে কাজে ক্ষতি আছে তা হতে বাঁচা যায়”[10]।

আল্লামা জুরজানী রহ. বলেন,

الورع: اجتناب الشبهات خوفاً من الوقوع في المحرمات

“দ্বীনদারি হল, সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ হতে বেঁচে থাকা, যাতে হারামে লিপ্ত না হতে হয়”[11]।

কোন কোন আলেম দ্বীনদারির সংজ্ঞা দিয়ে বলেন,

الورع :كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب

---

[9] তারিখে দামেশক ২৫৭/৫৪.

[10] মানাহেলুল এরফান: ৪২/২.

[11] আত-তারিফাত: ৩২৫.

“যে সব বস্তু তোমাকে সন্দেহ সংশয়ের দিকে নিয়ে যায়, তা ছেড়ে যেসব বস্তু তোমাকে সন্দেহ সংশয়ের দিকে নিয়ে যায় না, তার প্রতি ঝুঁকে পড়াকে পরহেজগারি বলে”[12]।

অপর একজন বিজ্ঞ আলেম বলেন,

حقيقة الورع: توقي كل ما يحذر منه، وغايته: تدقيق النظر في طهارة الإخلاص من شائبة الشرك الخفي

“দ্বীনদারির হাকিকত হল, যে বস্তুকে মানুষ আশঙ্কাযুক্ত মনে করে, তা হতে বিরত থাকা। আর তার শেষ গন্তব্য হল, ছোট শিরকের আশঙ্কা হতে নিয়তকে পুত-পবিত্র করার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দেয়া”[13]।

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, দ্বীনদারি ও পরহেজগারির সংজ্ঞায় বিভিন্ন ধরনের মতামত পরিলক্ষিত। সবার মতামতকে একত্র করার লক্ষ্যে আমরা বলব, পরহেজগারি ও দ্বীনদারির চারটি স্তর আছে:

এক- সাধারণ লোকের দ্বীনদারি: আর তা হল, হারাম বস্তু হতে বিরত থাকা।

দুই- নেককার লোকদের দ্বীনদারি: যে সব কাজে হারামের সম্ভাবনা রয়েছে, তা হতে বিরত থাকা।

---

[12] ফায়জুল কাদির: ৫২৯/৩.

[13] ফায়জুল কাদির: ৫৭৫/৩.

তিন- মুত্তাকীদের দ্বীনদারি: যে সব কাজে কোন ক্ষতি নাই সেসব কাজকে ক্ষতি হয় এমন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেড়ে দেয়া।

চার- সত্যবাদীদের দ্বীনদারি: এমন কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকা, যাতে বিন্দু পরিমাণও ক্ষতি নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা করে, না জানি কাজটি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে যায় অথবা না জানি কাজটি অপছন্দনীয় বা অপরাধের অন্তর্ভুক্ত হয়। এ আসংঙ্কা থেকে সে এ ধরনের কাজ করা হতে বিরত থাকে।

উপরে যে চারটি স্তরের কথা আলোচনা করা হয়েছে, তার কোন না কোন একটির ভিত্তিতে ওলামাগণ দ্বীনদারির সংজ্ঞা তুলে ধরেছেন।

পরহেজগারি বা দ্বীনদারির গুরুত্ব ও ফজিলত:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করার হিকমত অসংখ্য ও অগণিত; এসব হিকমতের বর্ণনা দিয়ে শেষ করা যাবে না। তবে হিকমতসমূহের অন্যতম হিকমত হল, মানুষকে পরহেজগার ও মুত্তাকী বানানো। অর্থাৎ, মানুষ যাতে তাকওয়া, পরহেজগারি ও দ্বীনদারির গুণে গুণান্বিত হতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ হাসিলে সক্ষম হয়, তার জন্যই কুরআন নাযিল করা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে এরশাদ করে বলেন,

﴿ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ۝١١٢ وَكَذَٰلِكَ أَنزَلْنَٰهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝١١٣ ﴾ [سورة طه: ١١٣.]

"আর এ ভাবেই আমি আরবী ভাষায় কুরআন নাযিল করেছি এবং তাতে বিভিন্ন সতর্কবাণী বর্ণনা করেছি, যাতে তারা মুত্তাকী হতে পারে অথবা তা হয় তাদের জন্য উপদেশ"। [সূরা তাহা, আয়াত: ১১৩]

আল্লামা ক্বাতাদাহ রহ. আল্লাহর বাণীতে জিকির শব্দের ব্যাখ্যায় বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দ্বীনদারি, পরহেজগারি ও তাকওয়া[14]।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনে করীমে দ্বীনদার লোকদের কামিয়াবি লাভ ও সফলতার একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা তাদের প্রশংসনীয় অবস্থার উপর অটল ও অবিচল থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَٰكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَٰتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ۝١٢٨ ﴾ [سورة طه: ١٢٨.]

"এটি কি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করল না যে, আমি তাদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠিকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বাসভূমিতে তারা বিচরণ করে? নিশ্চয় এর মধ্যে রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য নির্দশন"। [সূরা তাহা, আয়াত: ১২৮]

---

[14] তাফসীরে তাবারী ৪৬৪/৮.

আল্লামা ক্বাতাদাহ রহ. বলেন,

أولو النهى هم أهل الورع

“জ্ঞানী তারাই যারা দ্বীনদার ও পরহেজগার”[15]।

মানুষ যাতে পরহেজগার ও দ্বীনদার হয়, তার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার স্বীয় কিতাব মহাগ্রন্থ আল কুরআন নাযিল করেন এবং কুরাআনে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। এতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, দ্বীনদারি অবলম্বন করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি।

মনে রাখতে হবে, আমরা যে তাকওয়া বা দ্বীনদারিকে ওয়াজিব বলছি তা হল উল্লেখিত দ্বীনদারির স্তরসমূহের সর্বনিম্ন স্তর।

দ্বীনদারি অবলম্বন করার ফজিলত:

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন হাদিসে দ্বীনদারি অবলম্বন করার অনেক ফজিলত বর্ণনা করেন। এখানে কিছু ফজিলত তুলে ধরা হল। যেমন-

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« يَا هُرَيْرَةَ، كُنْ ورِعا تَكُنْ أَعبَدَ النَّاسِ أَبَا»

---

[15] তাফসীরে তাবারী ৪৭৫/৮.

“হে আবু হুরাইরা তুমি মুত্তাকী ও পরহেজগার হও, তাহলে তুমি সমগ্র মানুষের চেয়ে বড় ইবাদতকারী বলে বিবেচিত হবে”[16]। সায়াদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« خَيْرُ دِينِكُمُ الْوَرَعُ»

“তোমাদের উত্তম দ্বীন হল তোমাদের দ্বীনদারি”[17]।

হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত[18]। আমর ইবন ক্বাইস আল মালায়ী হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« مَلَاكُ دِينِكُم الْوَرَع »

“তোমাদের দ্বীনের রাজত্ব হল, দ্বীনদারি”[19]।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[16] ইবনে মাজাহ: ৪২১৭ আল্লামা আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[17] হাকেম: ৩১৪ আল্লামা যাহাবী রহ. হাদীসটির সমর্থন করেন।

[18] হাকেম ৩১৭, তিবরানি মুজামুল ওসীত, ৩৯৬০, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[19] মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ: ২৬১১৫.

« ما أعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيءٌ من الدنيا، ولا أعجبه منها إلا وَرِعاً »

"দুনিয়ার কোন বস্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মুগ্ধ করতে পারেনি। পরহেজগারি ও দ্বীনদারি ছাড়া কোন কিছুই তাকে সে পরিমাণ আনন্দ দিতে পারেনি যে পরিমাণ আনন্দ তাকে তাকওয়া দিয়েছে"[20]।

মনে রাখতে হবে, দুনিয়ার প্রতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর বিন্দু পরিমাণ আগ্রহ ছিল না। তাই যখন তার নিকট দুনিয়ার কোন ধন-সম্পত্তি আসত, তখন তিনি সেগুলোকে তাড়াতাড়ি বণ্টন করে দিতেন। নিজের কাছে কিছুই রাখতেন না। তিনি ইলম, আমল ও দ্বীনদারিকে অধিক গুরুত্ব দিতেন। হারাম ও হালালের বরখেলাফ করাকে তিনি কোন ক্রমেই মেনে নিতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে দ্বীনদারি অবলম্বনের গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অনুরূপভাবে আমাদের সালফে সালেহীনগণও দ্বীনদারি অবলম্বনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন এবং তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তারা তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে তাকওয়া অর্জন ও দ্বীনদারি অবলম্বন করার জন্য উৎসাহ প্রদান করেন। বিভিন্নভাবে মানুষদের দ্বীনদারি অর্জনের দিকে আহ্বান করতেন। যেমন-

ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

---

[20] তাবরানী মুজামুল ওসীত: ৫৩৫.

শেষ রাতে নড়াচড়া করা অর্থাৎ তাহাজ্জদ পড়া বা জিকির আজকার করার নাম কিন্তু দ্বীন নয়, দ্বীন হল, দ্বীনদারি এ পরহেজগারি অবলম্বন করা[21]।

অর্থাৎ, যারা দ্বীনদারি অবলম্বন করে তারাই হল, সত্যিকার দ্বীনদার। অনেকে আছে ভোর রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়ে, কিন্তু হারাম হালালের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না, মানুষের হকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, ন্যায় অন্যায়ের কোন বিচার বিশ্লেষণ করে না। এরা সত্যিকার দ্বীনদার নয়। তাদের তাহাজ্জুদ দ্বারা তারা কোন উপকৃত হতে পারবে না

হাসান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সর্বোত্তম ইবাদত হল, চিন্তা-ফিকির করা ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা[22]। তিনি আরও বলেন, হিকমত ও বুদ্ধিমত্তা হল, দ্বীনদারি[23]।

অর্থাৎ, যারা চিন্তা-ফিকির করে, তাদের মধ্যে সত্যিকার মানবতা জাগ্রত হয়। তখন তারা তাদের নিজেদের ব্যাপারে এবং মানুষের ব্যাপারে সতর্ক হয়। মানুষের হক তারা নষ্ট করে না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর হকও তারা নষ্ট করে না। তাদের দ্বারা কোন প্রকার অন্যায় অনাচার সংঘটিত হয় না। তার হারাম থেকে বিরত থাকে। চিন্তা-ফিকির করার গুরুত্ব এতই বেশি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চিন্তা ফিকির করাকে ইবাদত বলে আখ্যায়িত করেন।

---

21 ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, আয-যুহুদ ১২৫.

22 ইবনে আবিদ-দুনিয়াম, আল-ওয়ারয়ু ৩৭.

23 তাফসীরে বগবী ৩৩৪/১, তাফসীরে কুরতবী ৩১৩/৩.

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব রহ. বলেন, ইবাদত হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা হারাম করেছেন, তা হতে বিরত থাকা এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিদর্শনসমূহের চিন্তা করা[24]।

হারাম থেকে বিরত থাকা যে ইবাদত এতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, একটি হাদিসে বর্ণিত স্ত্রীর সাথে সহবাস করাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবাদত বলে আখ্যায়িত করলে একজন সাহাবী তাকে জিজ্ঞাসা করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! একজন লোক তার স্ত্রীর সাথে যৌন চাহিদা নিবারণ করল তা কিভাবে ইবাদত হতে পারে? তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদি লোকটি যৌবিক চাহিদা তার স্ত্রীর সাথে না মিটিয়ে অন্য কোন মহিলার সাথে ব্যভিচার করত, তাহলে তাতে কি তার গুনাহ হত? সাহাবী বলল, অবশ্যই গুনাহ হত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যেহেতু সে হারামে না গিয়ে হালাল উপায়ে প্রয়োজন মেটালো এবং হারাম থেকে বিরত থাকল, এটা তার জন্য অবশ্যই ইবাদত।

আল্লামা মুতাররফ ইবনে শিখির রহ. বলেন, তোমাদের সর্বোত্তম দ্বীন হল, তোমাদের পরহেজগারি ও দ্বীনদারি[25]। দ্বীনদারি ছাড়া দ্বীনদারির কোন দাম নাই। একজন ব্যক্তি তখন ঈমানদার হতে পারবে যখন তার মধ্যে দ্বীনদারি থাকবে।

তিনি আরও বলতেন, তোমরা দুইজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলে দেখবে, একজন অনেক সালাত ও সাওম আদায় করে এবং বেশি বেশি

---

[24] তাফসীরে কুরতবী ৩০১/৪

[25] তাফসীরে তাবারী: ১৭/১৬.

আল্লাহর রাস্তায় দান করে। আর অপর ব্যক্তি যে বেশি সালাত বা সাওম আদায় করে না এবং বেশি বেশি সদকাও করে না। সে তার থেকে উত্তম। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল তা কিভাবে সম্ভব? তখন সে বলল, লোকটি তার অপর ভাইয়ের তুলনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব বিষয়ে নিষেধ করছেন, সে বিষয়ে অধিক সতর্ক ও পরহেজগার[26]।

এখানে একটি কথা স্পষ্ট হয়, শুধু সালাত, সাওম ও দান-খয়রাত দিয়ে দ্বীনদার হওয়া যায় না। দ্বীনদার হওয়ার জন্য তোমাকে অবশ্যই হারাম থেকে বেঁচে থাকতে হবে। হারাম থেকে বেঁচে থাকা নফল ইবাদত বন্দেগী হতে অধিক উত্তম। আল্লামা ইয়াহয়া ইবনে কাসীর রহ. বলেন, সর্বোত্তম আমল হল, পরহেজগারি ও দ্বীনদারি[27]। মানুষ যখন হারাম থেকে বেঁচে থাকবে তখনই তার মধ্যে দ্বীনদারি পাওয়া যাবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুত্তাকীদের অধিক ভালোবাসেন। আর মুত্তাকী তারাই যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকে এবং যা করতে বলছেন তা পালন করেন। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক আদায় করেন এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মাখলুকের হকও আদায় করেন। প্রত্যেক হকদারকে তাদের পাওনা যথাযথভাবে আদায় করেন।

দ্বীনদারির সাথে শরীয়তের জ্ঞান একত্র হওয়ার ফজিলত:

একজন জ্ঞানী লোকের দ্বীনদারি সাধারণ মানুষের দ্বীনদারির মত নয়। যারা জ্ঞানী তাদের তাকওয়া ও দ্বীনদারি অধিক শক্তিশালী হয়ে থাকে।

---

[26] তাফসীরে তাবারী: ১৭/১২ এবং মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ ৩৫৪৯১.

[27] শুয়াবুল ঈমান: ৮১৪৯.

কারণ, তাদের তাকওয়া দ্বারা তারা যে উপকার লাভ করে অন্যরা তা লাভ করতে সক্ষম নয়। কোন কোন কবি বলেন,

وَإنَ فقِيهاً وَاحِداً مُتَوِّرعاً

أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ

“নিশ্চয় একজন দ্বীনদার জ্ঞানী শয়তানের জন্য এক হাজার আবেদ হতে অধিক শক্তিশালী”[28]।

এ কারণেই আলেমগণ শর্তারোপ করেন, একজন বিচারক যিনি মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করবে, তাকে অবশ্যই শরিয়তের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানী হতে হবে। সে যদি শরিয়তের বিষয়ে জ্ঞানী না হয়, তাহলে সে কিভাবে ন্যায় বিচার করবে। কারণ, ন্যায় বিচারের উৎসই হল একমাত্র কুরান ও সুন্নাহ। সুতরাং, যারা বিচারক হবে তাদের অবশ্যই কুরান ও সুন্নাহ সম্পর্কে ইলম থাকতে হবে। অন্যথায় তাদের দ্বারা ন্যায় বিচার সংঘটিত হবে না। তাদের থেকে ন্যায় বিচারের আশা করা আকাশ কুসুম সমতুল্য।

দুনিয়াতে মানুষের মধ্যে বিচার ফায়সালা করা, একটি মহৎ কাজ, এতে রয়েছে বড় ধরনের ইজ্জত ও সম্মান। এছাড়া এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তব্য, যারা বিচারক কিংবা হাকিম হয়ে থাকে, তাদের অবশ্যই সতর্ক হতে হয় এবং জ্ঞানে পরিপূর্ণ হতে হয়। অন্যথায় তারা বিচার কাজ পরিচালনায় ভুল করতে পারে যা একজন মানুষের জীবনে

---

[28] আত-তারিফ ১৯৯.

বিপর্যয় ডেকে আনবে। দুইজন মানুষের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক সমস্যা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি, কাটা-কাটি হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। বরং বর্তমান যুগে সমাজে ও দেশে এগুলো প্রতিনিয়তই সংঘটিত হচ্ছে। এ সব ঝগড়া-বিবাদ ও মতবিরোধের বিচার ফায়সালা বা সমাধানের স্থান হল, বিচারালয় ও আদালত। বিচারালয় ও আদালত হল, মানুষের অধিকার নিশ্চিত করা বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। এটাই মানুষের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল। এখানে এসে মানুষ ন্যায় বিচার পাওয়ার আশা করে। কিন্তু এখান থেকে যদি ন্যায় বিচার না পায় তাহলে তার আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং এখানে যারা বিচার করবে তাদের অবশ্যই জ্ঞানী ও সৎ হতে হবে। তারা যদি জ্ঞানী না হয় এবং অসৎ হয় তাহলে মানুষ তাদের ন্যায্য অধিকার হতে বঞ্চিত হবে এবং মানবতা ধুলায় মিশে যাবে। এ কারণেই বলা যায় যে, যারা মানুষের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে তাদের অবশ্যই দ্বীনদার ও জ্ঞানী হতে হবে। তাদের দ্বীনদার ও জ্ঞানী হওয়ার কোন বিকল্প নাই।

সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলো ছেড়ে দেয়া:

একটি কথা মনে রাখতে হবে, হালাল হারামের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে, যেগুলো হারাম কি হালাল তা স্পষ্ট নয়। এ ধরনের সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকা হল, সত্যিকার দ্বীনদারি। যারা এ সব সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকে না তারা হারামে লিপ্ত হতেও কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ করে না।

নুমান ইবনে বাশির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

«إن الحَلَال بَيِّن وَالحَرَامَ بين، وَبَيْنَهمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلُمهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرأَ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ، وَمَن وقَع فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى أَوْشَكَ أَنْ يُواقَعهُ، أَلَا وَإِنّ لكِلّ مَلكٍ حمىً، أَلَا وَإِنّ حِمَى الله في أَرضِهِ محَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الجَسِد مُضْغَةً إِذا صلَحتْ صَلَح الجَسَدُ كُلُه، وإذا فَسَدتْ فَسَد الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ »

“হালাল ও হারাম উভয়টি স্পষ্ট। তবে উভয়ের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বস্তু আছে, যা অধিকাংশ মানুষ জানে না। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকবে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জত-সম্মানকে অটুট রাখল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বেঁচে থাকল না, তার জন্য সমূহ সম্ভাবনা আছে যে, সে হারামে পতিত হবে। যেমন- একজন রাখাল সে ক্ষেতের পাশে ছাগল চরায় তার মধ্যে এ আশঙ্কা থাকে, সে ক্ষেত নষ্ট করবে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে প্রত্যেক বাদশার জন্য একটি

নির্ধারিত ময়দান রয়েছে, আর জমিনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ময়দান হল, তার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, মানুষের দেহের মধ্যে একটি গোস্তের টুকরা রয়েছে, যখন তা সংশোধন হয়, তাহলে পুরো দেহটি ঠিক থাকে আর যখন তার মধ্যে যে টুকরা রয়েছে, তা নষ্ট হয়, তাহলে তার পুরো দেহটাই নষ্ট হয়। আর তা হল মানুষের অন্তর[29]।

ওয়াবেছাতা ইবনে মাবাদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

« الإِثْمُ: مَا حَاكَ فِي القَلْبِ، وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ، وَإِنِ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ »

“গুনাহ হল, যা তোমার অন্তরে সংকোচ মনে হয়, এবং মনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্ধ সৃষ্টি করে। আর যদি মানুষ ফতওয়া দেয়, তখন ....[30]

হাসান ইবনে আবি সিনান রহ. বলেন, দ্বীনদারি হল, যখন কোন কিছু তোমাকে সন্দেহে ফেলে, তাকে তুমি ছেড়ে দেবে। এটাই হল, তোমার পরহেজগারি ও দ্বীনদারি[31]।

---

[29] বুখারি ৫২ এবং মুসলিম ১৫৯৯.

[30] আহমদ ১৮০৩০, আলবানী হাসান বলেন.

[31] আল-ওয়ারয়ু ইবনে আবিদ-দুনিয়ার ৪৬

কতক মুবাহ ও হালাল বস্তু হতে বিরত থাকা:

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, দ্বীনদারি হল, যেসব কর্ম-কাণ্ড তোমার ক্ষতির কারণ হয়, তা হতে বিরত থাকা। মানবজাতিকে যেমনিভাবে হারাম হতে বিরত থাকতে হবে, অনুরূপভাবে সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ হতেও বিরত থাকতে হবে। কারণ, সন্দেহযুক্ত বস্তুও অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়। যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকে, সে তার দ্বীন ও ইজ্জত-সম্ভ্রমের হেফাজত করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহযুক্ত কর্ম-কাণ্ডে লিপ্ত হল, সে অবশ্যই হারামে পতিত হল। যেমন- একজন রাখাল সে ফসলের ক্ষেতের পাশে ছাগল চরাচ্ছিল, তার জন্য আশঙ্কা থাকে, তার ছাগলটি ফসলে গিয়ে পতিত হবে এবং ফসলের ক্ষতি করবে।

সুতরাং, একজন মুসলিমের কর্তব্য হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন তার কাছে যাওয়া হতে বিরত থাকা। কারণ, তার নিকট যাওয়াতে তোমাদের জন্য হারামে লিপ্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقۡرَبُوهَاۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١٨٧ ﴾

[سورة البقرة: ١٨٧.]

“এটা আল্লাহর সীমারেখা, সুতরাং তোমরা তার নিকটবর্তী হয়ো না। এভাবেই আল্লাহ তার আয়াতসমূহ মানুষের জন্য স্পষ্ট করেন, যাতে তারা তাকওয়া অবলম্বন”। [সূরা বাকারাহ, আয়াত, ১৮৭]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٢٢٩﴾ ﴾ [سورة البقرة: ٢٢٩.]

"সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না। তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালেম"। [সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২২৯]

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সীমানা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, হালালের শেষ প্রান্ত যার নিকট যেতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষকে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সীমা-রেখার অপর অর্থ, হারামের প্রাথমিক অবস্থা। তখন অর্থ হবে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের জন্য যা হালাল বা বৈধ করছেন, তা অতিক্রম করো না। আর তোমাদের জন্য যা হারাম করেছে, তার কাছেও তোমরা যেও না। সুতরাং, দ্বীনদারি হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর বিধানের সীমা রেখার কাছে যাওয়া ও অতিক্রম করা হতে নিরাপদ থাকা। হালাল বিষয়ে সীমা অতিক্রম করা দ্বারা বড় কবিরা গুনাহ ও কঠিন হারামে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সালফে সালেহীনদের থেকে বর্ণিত, তারা অনেক সময় হারাম ও নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কায় বিভিন্ন ধরনের হালাল ও বৈধ কাজ হতেও বিরত থাকতেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আমি আমার মাঝে এবং হারামের মাঝে হালাল দ্বারা একটি প্রাচীর তৈরি করতে চাই, যাকে আমি হারাম মনে করি না[32]।

আল্লামা সুফিয়ান ইবন উয়াইনাহ রহ. বলেন, একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের হাকীকত উপভোগ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মাঝে এবং হারামের মাঝে হালাল দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে। আর যতক্ষণ পর্যন্ত সে গুনাহ ও গুনাহের সাদৃশ্য বিষয়গুলো না ছাড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পরিপূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না[33]।

মাইমুন ইবন মাহরান রহ. বলেন, একজন মানুষ যতদিন পর্যন্ত তার মাঝে ও হারামের মাঝে হালাল দ্বারা প্রতিরোধ গড়ে না তুলে, ততদিন পর্যন্ত সে ঈমানদার হতে পারবে না[34]।

কোন কোন সালফে সালেহীনগণ বলেন, একজন বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত তাকওয়ার সাধ গ্রহণ করতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে ক্ষতি নাই

---

[32] ইমাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু: ৫০.

[33] ইমাম আহমদ, আল-ওয়ারয়ু: ৫০.

[34] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৮৪.

এমন বস্তুকে যে বস্তুতে ক্ষতি আছে তার থেকে বাঁচার জন্য পরিহার করবে না[35]।

কোন কোন মনীষী বলেন, আমরা হালাল বিষয়ের সত্তরটি বিষয় ছেড়ে দিতাম যাতে আমরা হারাম থেকে বাঁচতে পারি[36]।

উপরের আলোচনা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়, তা হল, দ্বীনদারির একটি দিক হল, অনেক সময় কিছু কাজ আছে যেগুলোতে কোন ক্ষতি নাই তারপরও আমাদের সলফগণ তা করা হতে বিরত থাকতেন। তার কারণ হল, এ ধরনের বৈধ কাজগুলো অনেক সময় মানুষকে খারাপ কাজের দিকে নিয়ে যায় বা কোন আশঙ্কা সৃষ্টি করে। কিন্তু এ ধরনের বৈধ কাজ ছেড়ে দেয়ারও একটি নিয়মনীতি আছে, সব বৈধ কাজ ছেড়ে দেয়া যুক্তিযুক্ত নয়।

কোন কোন বৈধ বিষয় আছে যেগুলো ছেড়ে দেয়া বৈধ নয়। কারণ, এ সব বৈধ কাজগুলো ছেড়ে দেয়া রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত হতে বিরত থাকার নামান্তর। যেমন, বিবাহ করা ছেড়ে দেয়া, ঘুম যাওয়া ও খাদ্য গ্রহণ ছেড়ে দেয়া। কারণ, এ গুলো সবই হল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে বিবাহ করেছেন, তিনি ঘুমাতেন এবং তিনি খাদ্য গ্রহণ করতেন। সুতরাং এগুলো থেকে বিরত থাকা কোন পরহেজগারি বা দ্বীনদারি নয়।

---

[35] মাদারেজুস-সালেকীন ২২.

[36] মাদারেজুস-সালেকীন ২২.

অনুরূপভাবে কোন কোন বৈধ কাজ আছে যেগুলো নিয়ত ভালো হওয়ার কারণে ইবাদতে পরিণত হয়। যেমন- কোন ব্যক্তি খাওয়া খেল এবং নিয়ত করল, আমি খাদ্য গ্রহণ করে যে শক্তি অর্জন করব তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ইবাদতে ব্যয় করব। এ ধরনের নিয়ত করার ফলে একজন মানুষের খাওয়া পরা ও ঘুম ইবাদতে রূপান্তরিত হবে। অথবা কোন ব্যক্তি তার স্ত্রী ও সন্তানের সাথে খেল-তামাশা করা দ্বারা নিয়ত করল, সে তার প্রবৃত্তির চাহিদা ও মানবিক চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যেই তা করছে, তাহলে তা দ্বারা সে অবশ্যই ছাওয়াব পাবে এবং তার কর্মগুলো ইবাদতে পরিণত হবে। আর যে ব্যক্তি দ্বীনদারি মনে করে বিবাহ করা ও স্ত্রী-সন্তানের সাথে খেল-তামাশা ইত্যাদি ছেড়ে দেয়, তাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, এগুলো ছেড়ে দেয়া কোন ইবাদত নয়। বরং এগুলো হল, বৈরাগ্যতা। ছেলে সন্তান ছোট বাচ্চাদের আদর করা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কে সতর্ক থাকা অবশ্যই ইবাদত। আর তাদের আদর যত্ন করা হতে বিরত থাকার মধ্যে কোন বুজুর্গি নাই। অনেক লোক আছে তারা তাদের ছেলে মেয়েদের আদর করা তাদের চুমু দেয়া ইত্যাদি হতে বিরত থাকে তার মনে এটা হল, দ্বীনদারি বা বুজুর্গি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা কোন দ্বীনদারি বা বুজুর্গি নয়।

দ্বীনদারির ব্যাপকতা:

মানুষ পরহেজগারি ও দ্বীনদারির বিবেচনায় চার শ্রেণীতে বিভক্ত। ইব্রাহিম ইবনে আদহাম রহ. বলেন, দ্বীনদারির বিবেচনায় মানুষ চার প্রকার। এক শ্রেণীর লোক যারা অল্প ও বেশি উভয় প্রকার বস্তু থেকে পরহেজগারি বা দ্বীনদারি অবলম্বন করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক আছে, যারা শুধু অল্প বস্তু থেকে বেঁচে থাকে। কিন্তু যখন তাদের সামনে বেশি

বা মোটা অংকের কোন বস্তু আসে, তখন তা থেকে তারা বেঁচে থাকে না। তৃতীয় শ্রেণির লোক, যারা অধিক থেকে বেঁচে থাকে, কিন্তু কম বস্তুকে তারা ছোট ও তুচ্ছ মনে করায়, তা থেকে বেঁচে থাকে না। চতুর্থ শ্রেণীর লোক, যারা কম ও বেশি কোন কিছু থেকে তারা তাদের নিজেদের বিরত রাখে না[37]।

প্রথম শ্রেণীর লোক: এরা হল, তারা যারা ছগীরা ও কবিরা উভয় প্রকার গুনাহ হতে নিজেদের বিরত রাখেন। তারা কোন ছগীরাগুণাহ করে না এবং কবিরা গুনাহও করে না।

দ্বিতীয় প্রকার লোক: সাধারণ মানুষের মত, তারা মানুষের অল্প সম্পদ ভক্ষণ করা হতেও বিরত থাকে। কিন্তু যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে মানুষের উপর ক্ষমতা বা সুযোগ দেয়, তখন সে মানুষের বড় বড় সম্পদ হনন করে। তারা বলে অল্প খেয়ে দুর্নাম কামানোর প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় প্রকার: এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক। তারা কোন ব্যভিচার করে না, চুরি ডাকাতি ও হত্যা রাহাজানি করে না, কবিরা গুনায় লিপ্ত হয় না এবং সুদ-ঘোষ খায় না। কিন্তু তারা ছগীরা গুনাহ হতে বেঁচে থাকে না। তারা ছগীরা গুনাহ করতে থাকে। যেমন- তারা তাদের দৃষ্টির হেফাজত করে না, কানের হেফাজত করে না, রাস্তা ঘাটে তারা নারীদের দিকে তাকায় এবং গান-বাজনা ইত্যাদি তারা শ্রবণ করে। সমাজের বেশির ভাগ লোক এ ধরনেরই হয়ে থাকে।

---

[37] তারিখে বাগদাদ: ১৯৯/৬.

চতুর্থ প্রকার লোক: যারা ছগীরা গুনাহ ও কবিরা গুনাহ কোন কিছু থেকেই বেঁচে থাকে না। তারা সব ধরনের গুনাহ করে এবং সব ধরনের অন্যায় তারা করতে পারে।

পরহজেগারি ও দ্বীনদারির বাস্তবতা হল, তা সমগ্র দিকগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে। কোন একটি দিক যদি অপূর্ণ থাকে, তবে তাকে দীনদার ও পরহেজগার বলা যাবে না। মোটকথা, মুত্তাকী হল, সে লোক যে তার উপর অর্পিত সব দায়িত্ব ও ওয়াজিবসমূহ পালন করে। আর যেসব নিষিদ্ধ কাজ হতে তাদের বিরত থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকে। এ ছাড়াও যাবতীয় সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত বিষয় হতে তারা বিরত থাকে। সুতরাং, এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে, দ্বীনদারি একটি ব্যাপক অর্থকে সামিল করে। একজন ব্যক্তি যখন ইসলামের আদেশ-নিষেধ ও হারাম-হালাল বেঁচে চলবে, তাকে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলা হবে না। তাকে এর সাথে সাথে এমন সব বিষয় হতে বেঁচে থাকতে হবে, যেগুলোর বিষয়ে সরাসরি আদেশ নিষেধ না থাকলেও কিন্তু তার সাথে মানবিকতা ও মনুষ্যত্ব জড়িত।

আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. বলেন, যদি কোন ব্যক্তি একশটি বস্তু হতে নিজেকে বিরত রাখল, কিন্তু একটি হতে সে নিজেকে বিরত রাখতে সক্ষম হল না, তাহলে তাকে মুত্তাকী ও পরহেজগার বলা যাবে না[38]। এ কারণেই বলা হয়ে থাকে, তোমরা পরিপূর্ণ দ্বীনের মধ্যে প্রবেশ কর এবং পূর্ণ মুসলিম হও। এমন লোকদের মত হইয়ো না, যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও খুশি রাখে এবং শয়তানকেও খুশি রাখে।

---

[38] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

সুতরাং, মনে রাখতে হবে, মুত্তাকী হতে হলে, তাকে অবশ্যই যাবতীয় সব ধরনের অপরাধ থেকে বেচে থাকতে হবে। ছোট বড় কোন অপরাধ তার দ্বারা সংঘটিত হতে পারবে না। তবেই সে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলে বিবেচিত হবে। এ ছাড়া একজন পরহেজগার বা দ্বীনদার লোক তাকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে। তার থেকে যেন কোন নফল ইবাদতও যাতে না ছুটে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। তাকে হতে হবে একজন পরিপূর্ণ সুন্নাতের অনুসারী।

অনুরূপভাবে একজন লোককে মুত্তাকী বা পরহেজগার বলে আখ্যায়িত করতে হলে, তার আবশ্যক হল, যাবতীয় সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের হেফাজত করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যাতে কোন প্রকার অপরাধে জড়িত না হয় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। পরহেজগার লোক তার অন্তর, লিসান, হাত, পা, চক্ষু ও কর্ণ সবকিছুকে মুত্তাকী বানাবে; অন্যথায় তাকে পরহেজগার বলা যাবে না। সুতরাং, যদি কোন ব্যক্তি তার কোন এক অঙ্গকে হেফাজত করল, আর বাকি অঙ্গ হেফাজত করল না, তাহলে তাকে দ্বীনদার ও পরহেজগার বলা যাবে না। যেমন- কোন ব্যক্তি অন্তরকে বাঁচিয়ে রাখল, কিন্তু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অন্যায় অনাচার বা অপরাধ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল না, তাহলে তাকে দ্বীনদার বলা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার লিসানকে হেফাজত করল, কিন্তু তার অন্যান্য অঙ্গকে যেমন- চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদিকে সে হেফাজত করতে পারল না, তাহলে তাকে দ্বীনদার ও পরহেজগার বলা যাবে না। সুতরাং, একজন মুসলিমকে এমন সব ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকতে হবে, যেগুলো তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির দিকে নিয়ে যায় এবং তার জন্য নিশ্চিত ধ্বংস ডেকে আনে। চাই সেগুলো চোখের কর্মকাণ্ড হোক

বা হাত-পায়ের কর্মকাণ্ড। অনুরূপভাবে হাত, পা ও লজ্জা-স্থান ইত্যাদির কারণেও মানুষ নিশ্চিত ধ্বংসের মুখোমুখি হয়ে থাকে। সুতরাং মানুষের উপর কর্তব্য হল, তারা যাবতীয় অন্যায় ও অপকর্ম থেকে তার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করবে।

আর একটি কথা মনে রাখতে হবে, একজন মুসলিমের জন্য সবচেয়ে বড় কঠিন ও কষ্টকর কাজ হল, জবানের হেফাজত করা এবং জবানকে বিভিন্ন ধরনের অন্যায়, অনাচার হতে বিরত রাখা। হাসান ইবন সালেহ রহ. বলেন, আমরা দ্বীনদারির অনুসন্ধান করে দেখতে পাই যে, জবান ছাড়া আর কোন কিছুতে তা এত দুর্বল নয়। জবানে দ্বীনদারির পরিমাণ একেবারেই কম[39]।

আল্লামা ফুজাইল ইবন আয়াজ রহ. বলেন, সবচেয়ে বড় কঠিন পরহেজগারি ও দ্বীনদারি হল, মানুষের জবান[40]। যে লোকের জবান ঠিক থাকবে তার অন্য সবকিছু এমনিতেই ঠিক থাকবে।

জুনাইদ রহ. বলেন, কথার মধ্যে দ্বীনদারি অবলম্বন করা অন্যান্য অঙ্গের বিষয়ে তাকওয়া বা দ্বীনদারি অর্জন করা হতে কঠিন[41]।

আল্লামা ইসহাক ইবন খলফ রহ. বলেন, কথার মধ্যে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা স্বর্ণ, রুপা ও ধন-দৌলত বিষয়ে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অর্জন হতে অনেক কঠিন[42]।

---

[39] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

[40] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

[41] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৬৭.

প্রকাশ্যে ও গোপনে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি অবলম্বন করা:

একটি কথা মনে রাখতে হবে, সত্যিকার দ্বীনদার বা পরহেজগার তারা, যারা প্রকাশ্যে ও গোপনে উভয় অবস্থায় দ্বীনদারি অবলম্বন করে: তারা লোক দেখানোর জন্য শুধু প্রকাশ্যে দ্বীনদারি আর গোপনে নাফরমানি অবলম্বন করে না। অনেক মানুষ আছে তাদের চেহারা মানুষের সামনে এক রকম আর মানুষের অগোচরে অন্য রকম। এরা লোক দেখানোর জন্য দীনদারি অবলম্বন করে বাস্তবে তারা দ্বীনদার নয়। এরা মূলত: মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাদের মত হওয়া থেকে হেফাজত করুন। আমীন।

মানব সমাজে এ ধরনের লোকের অভাব নাই। এদেরকে কেউ বিশ্বাস করে না এবং সমাজে তাদের কোন অবস্থান থাকে না। তারা যখন যা করার সুযোগ পায় তা করে।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তার সাথী সঙ্গীদের নিয়ে একদিন মদিনার অদূরে কোন এক প্রান্তে মানুষের অবস্থা পর্যবেক্ষণে বের হন। স্থানীয় লোকেরা তাদের জন্য খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করে এবং তাদের জন্য খাওয়ার দস্তরখান বিছিয়ে দেয়। তারা সবাই খাওয়ার দস্তরখানে বসল এমতাবস্থায় একজন ছাগলের রাখাল তাদের সালাম দিল। তখন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাখালকে বলল, হে রাখাল! তুমি আস, আমাদের সাথে খাওয়াতে শরিক হও। সে বলল, না আমি খাব না আমি রোজাদার। তখন আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাখালকে বলল, তুমি এ প্রচণ্ড গরমের দিনে রোজা রাখছ এবং রোজা রেখে এ

---

[42] তারিখে দামেশক ২০৫.

পাহাড়ের পাদদেশে ছাগল চরাচ্ছ! আব্দুল্লাহ ইবন ওমরের কথার উত্তরে সে বলল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর কসম করে বলছি, আমি সে দিনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি যেদিন আমাদের খালি হাতে একত্র হতে হবে। একমাত্র আমল ছাড়া আমার আর কিছুই থাকবে না। তারপর আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে বললেন, তুমি আমাদের নিকট তোমার এ ছাগলগুলো হতে একটি ছাগল বিক্রি করবে? যদি বিক্রি কর আমরা তোমাকে ছাগলের মূল্য দেব এবং জবেহ করে তোমার জন্য গোস্ত দেব, যাতে তুমি গোস্ত দিয়ে ইফতার করতে পার। তখন সে বলল, এখানে যে ছাগলগুলো দেখছেন, তার একটিও আমার ছাগল না, এগুলো সব আমার মুনিবের। যখন তুমি একটি ছাগল হারাই ফেল, তখন তোমার মুনিবের আর কিছুই করার থাকবে না। তুমি বলবে একটি ছাগল বাঘে খেয়ে ফেলছে। এ কথা শোনে রাখালটি আকাশের দিকে হাত উঁচা করে এ কথা বলতে বলতে দৌড় দিল, আল্লাহ কোথায়? আল্লাহ কোথায়?[43]। তারপর ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু রাখালের কথাটি বলত এবং তাকে স্মরণ করত। তিনি যখন মদিনায় ফিরে আসে তখন তার মুনিবকে ডেকে পাঠালেন এবং তার থেকে তার ছাগলগুলো এবং রাখালকে কিনে নীল, তারপর রাখালকে মুক্ত করে দিল এবং তাকে ছাগলগুলো দিয়ে দিল।

একেই বলে দ্বীনদারি!। যে প্রকাশ্যে এবং গোপনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে এবং মুনিবের পিছনের মুনিবের খিয়ানত করে না।

---

[43] শুয়াবুল ঈমান:৫২৫১.

মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে পরহেজগারি ও দ্বীনদারির পরিবর্তন হয়:

মানুষের অবস্থার প্রেক্ষাপটে দ্বীনদারির সংজ্ঞা ও অবস্থারও পরিবর্তন হয়। একজন মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি, মান-মর্যাদা ও বয়স ইত্যাদি ভেদাভেদের কারণে দ্বীনদারিরও ভেদাভেদ ও পার্থক্য হয়।

যারা বয়সে ছোট তাদের দ্বীনদারি হল, বড়দের কার্য-কলাপ নিয়ে মাথা ঘামাবে না। তাদের কোন বিষয়ে তারা কোন মতামত দেবে না। আর যারা বড়, অভিজ্ঞ, জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান তাদের দ্বীনদারি হল, চুপ করে না থাকা। তারা তাদের মতামত ব্যক্ত করবে এবং যারা দায়িত্বশীল সরদার মাতবর তাদের সঠিক পরামর্শ দেবে। যাতে তারা কোন ভুল সিদ্ধান্ত জাতির উপর চাপিয়ে দিতে না পারে।

অনুরূপভাবে একজন জাহেল ও আলেমের দ্বীনদারি এক হতে পারে না। তাদের উভয়ের দ্বীনদারিতে অনেক তফাত আছে। একজন জাহেল লোক যা করতে পারে একজন আলেম তা করতে পারে না। একজন জাহেল ও আলেমের মধ্যে পার্থক্য হওয়াটা স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে যারা দায়িত্বশীল তাদের কাজ ও সাধারণ জনগণের কাজ এক হতে পারে না। দায়িত্বশীলরা যদি কোন ভুল করে তাহলে তাদের ভুলের খেসারত তাদের অধীনস্থ সবাইকে দিতে হবে। আর সাধারণ মানুষের ভুলের খেসারত কাউকে নিতে হয় না। সমাজে যখন কোন অন্যায় ও অপকর্ম হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তখন দায়িত্বশীলরা তা প্রতিহত করতে, সাধারণ মানুষকে তাদের সাথে সম্পৃক্ত করবে। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ ধরনের প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল হতে পারে না। আলেমদের কাজ কোন

চুপ করে বসে থাকা নয়। তাদের কাজ হল, তারা মানুষকে দিক নির্দেশনা দেবে এবং দায়িত্বশীলদের ভুল ধরিয়ে দিবে।

আল্লামা হুবাতুল্লাহিল মুকরি রহ. বলেন, একজন আলেমের দ্বীনদারি হল, প্রয়োজনের সময় কথা বলা। আর একজন জাহেলের দ্বীনদারি হল, চুপ থাকা[44]।

যদি কোন আলেম প্রয়োজনের সময় কথা না বলে, তাহলে তাকে বোবা শয়তান বলা চলে। আর জাহেলের কথার কোন দাম নাই। সে যখন কথা বলবে তখন উল্টা-পাল্টা কথা বলবে।

আল্লামা ইবন উয়াইনাহকে দ্বীনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, উত্তরে তিনি বলেন, দ্বীনদারি হল, যে ইলম দ্বারা দ্বীনদারিকে জানা যায়, সে ইলমের অনুসন্ধান করা। আর তা হল কারো কারো মতে অধিক চুপ থাকা এবং কথা কম বলা। অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন, একজন জ্ঞানী যে কথা বলে, সে আমার নিকট একজন জাহেল থেকে উত্তম যে কথা না বলে চুপ থাকে[45]।

ইলম ও দ্বীনদারি:

দ্বীনদারি এটি নি:সন্দেহে অন্তরের একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল ও মহান কর্ম। যারা দ্বীনদার তাদের মর্যাদা অধিক। তবে ইলম ছাড়া কখনোই দ্বীনদারি অর্জন করা যায় না। সুতরাং, এখানে একটি বিষয় জানা খুবই

[44] আল্লামা মুকরী রহ. এর নাছেখ ও মানছুখ ৩৮.

[45] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২৯৯/৭.

জরুরি, আর তা হল দ্বীনদারির সাথে ইলমের সম্পর্ক। সত্যিকার নির্ভুল বাস্তবতা হল, ইলম ছাড়া কখনো মুত্তাকী হওয়া বা দ্বীনদারি অর্জন করা সম্ভব নয়।

আল্লামা আবু মাসূদ রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা হারাম বা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, তা থেকে বেচে থাকাটা নির্ভর করছে হারাম হালাল সম্পর্কে জ্ঞান থাকার উপর। কোনটি হারাম আর কোনটি হালাল তা জানতে না পারলে হারাম-হালাল বেচে চলা সম্ভব নয়। আর হারাম হালাল সম্পর্কে জানার একমাত্র উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ। সুতরাং, হারাম হালাল সম্পর্কে জানতে হলে অবশ্যই কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। কারণ, কুরআন ও হাদিসের জ্ঞান ছাড়া হারাম হালাল সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। সুতরাং, বলা চলে, পরহেজগারি বা দ্বীনদারির জন্য ইলমের কোন বিকল্প হতে পারে না। ইলম ছাড়া দ্বীনদারি কচু পাতার পানির মত। যে কোন সময় তা ছুটে যেতে পারে। যে কোন সময় সে পথভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। শয়তানের জন্য একজন আবেদকে গোমরাহ করা কোন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু একজন আলেমকে গোমরাহ করা তার জন্য অতি কঠিন কাজ।

মোটকথা, ইলম ছাড়া দ্বীনদারি অর্জন করা যায় না এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর সান্নিধ্য লাভ করা যায় না।

শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, দ্বীনদারির পূর্ণতা হল, একজন মানুষ ভালোর ভালোকে জানা এবং খারাপের খারাপকে জানা। আর এ কথা অবশ্যই জানা থাকতে হবে, ইসলামী শরীয়তের ভিত্তি হল, কল্যাণ লাভকে নিশ্চিত করা ও কল্যাণকে পূর্ণতায় পৌঁছানো এবং

যাবতীয় সব ধরনের ক্ষতিকে প্রতিহত করা এবং যথাসম্ভব তা ধমিয়ে রাখা। অন্যথায় যে লোক কোন কাজ করা ও না করার মধ্যে ভালো মন্দ তারতম্য করতে পারে না এবং কোনটির মধ্যে শরীয়তে ইসলামী কল্যাণ রেখেছে আর কোনটির মধ্যে ইসলামি শরিয়ত অকল্যাণ বা ক্ষতি রেখেছে তার বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে না, তার অবস্থা এমন হবে সে কখনো সময় যা করা ওয়াজিব তা ছেড়ে দেবে আর যা করা নিষিদ্ধ তার করে বসবে। আবার কখনো সময় কোন কাজকে সে তাকওয়া মনে করবে কিন্তু বাস্তবে তা তাকওয়া নয়, বরং ইসলামী শরিয়তের পরিপন্থী। যেমন- অনেক লোককে দেখা যায় তারা জালিম ও অত্যাচারী বাদশাহর সাথে একত্র হয়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছেড়ে দেয়, তারা মনে করে এটি বুজুর্গি। [কিন্তু সত্যিকার অর্থে এটি কোন বুজুর্গি বা দ্বীনদারি নয়। এটি হল গোঁড়ামি ও মূর্খতা। বর্তমানেও এ ধরনের তথাকথিত বুজুর্গ ও পরহেজগারের অভাব নাই, যারা ঘরের কোণে ও চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকাকে দ্বীনদারি বা বুজুর্গি মনে করে। দেয়ালের বাহিরে এসে ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়াকে তাকওয়ার খেলাপ বা পরিপন্থী মনে করে। মূলত: এরা ইসলামের দুশমন। তাদের দ্বারা ইসলামের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি হয়ে থাকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ হতে হেফাজত করুন।]

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, যেমন- কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাবস্থায় কতক মুসলিম সৈন্য তাদের আমীরের নিকট এসে দেখতে পেল সে কোন শরীয়ত বিরোধী কাজে লিপ্ত, তখন তারা তার অবস্থা দেখে বলল, আমরা এ ফাসেকের সাথে থেকে যুদ্ধ করতে রাজি না। এ বলে তারা যদি যুদ্ধ করা হতে বিরত থাকে তাহলে কি লাভ হবে? এ ধরনের ভ্রান্ত

তাকওয়ার কারণে দুশমনরা এসে শহরকে দখল করে নেবে এবং মুসলিমদের বিপর্যয় নেবে আসবে। যার পরিণতি কারোর জন্যই শুভকর হবে না। দ্বীনদারি অবলম্বন করার জন্য সময় সুযোগ বুঝতে হবে। আর এ সব বুঝার জন্য প্রয়োজন জ্ঞান ও দক্ষতা।

ইলম ও জ্ঞানহীন দ্বীনদারির আরেক দৃষ্টান্ত হল, একজন লোকের পিতা মারা যাওয়ার পর তার কিছু সন্দেহযুক্ত সম্পদ আছে, যেগুলো তার পিতা দুনিয়াতে রেখে গেছে। সাথে সাথে তার এমন কতক পাওনাদারও আছে, যারা তার নিকট টাকা পাবে। তারপর লোকেরা যখন তার ছেলের নিকট এসে তাদের পাওনা দাবি করে, তখন সে বলে, আমি সন্দেহযুক্ত মাল হতে আমার পিতার দেনা পরিশোধ করা হতে বিরত থাকতে চাই।

এ ধরনের দ্বীনদারি ফাসেদ ও ভ্রান্ত এবং যারা এ ধরনের দ্বীনদারি অবলম্বন করে তারা মূর্খ। কারণ, সে তার পিতার সম্পদে সন্দেহ আছে এ কথা বলে, মানুষের অধিকার বা পাওনা পরিশোধ করা ছেড়ে দিচ্ছে। অথচ মানুষের পাওনা পরিশোধ করা তার উপর ওয়াজিব।

জ্ঞান না থাকা মানুষকে অনেক ভালো কাজ ও করনীয় কাজ হতে বঞ্চিত করে। কারণ, তারা মনে করে এ ধরনের কাজ না করাই দ্বীনদারি। অথচ, দ্বীনদারি হল, এ ধরনের কাজ করার মধ্যে। কিন্তু তার ইলম না থাকার কারণে সে তা বুঝতে পারে না। এ জন্য বলা বাহুল্য যে, দ্বীনদারি বা তাকওয়ার জন্য ইলম অবশ্যই থাকতে হবে। ইলম ছাড়া তাকওয়া বা দ্বীনদারির চিন্তা করা সম্পূর্ণ অবান্তর ও ভিত্তিহীন।

তারপর ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, অনেক লোককে দেখা যায়, তারা যে সব ইমামদের মধ্যে কোন প্রকার বিদআত বা অন্যায় দেখতে পায়, তাদের পিছনে জামাতে সালাত আদায় ও জুমার সালাত আদায় করা ছেড়ে দেয়। তারা মনে করে তাদের পিছনে সালাত আদায় করার চেয়ে একা সালাত আদায় করা বুজুর্গি। কিন্তু তাদের এ ধরনের ধারণা কুরআন ও হাদিসের সম্পূর্ণ বিপরীত। অনুরূপভাবে যখন কোন আলেমের মধ্যে কোন বিদআত পরিলক্ষিত হয় বা কোন সত্যি সাক্ষ্য-দাতা তার মধ্যে কোন ত্রুটি দেখা যায়, তখন তাদের থেকে ইলম হাসিল করা ও সাক্ষ্য কবুল করা হতে বিরত থাকে। তারা মনে করে তাদের থেকে হক কথা শোনে কবুল করা ছেড়ে দেয়া হল বুজুর্গি। অথচ হক কথা শোনা ও তা গ্রহণ করা হল ওয়াজিব[46]। কিন্তু তার ইলম না থাকার কারণে সে ওয়াজিব ছেড়ে দিচ্ছে। আর মনে করছে এটিই বুঝি তাকওয়া বা দ্বীনদারি।

একজন মুসলিমের আদর্শ হতে হবে, হক যেখানেই পাবে সে তার থেকে হককে কবুল করবে ও সত্যকে গ্রহণ করবে। মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে নয়। আমাদের সবারই ভুল হয়ে থাকে। সুতরাং, আমরা যেন অন্যের ভুল দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে না উঠি বরং আমাদের দেখতে হবে তার গুণ কি আছে? আমরা যদি সত্যিকার মুসলিম হই তখন আমরা তার গুণ থেকে উপকৃত হব, আর তার ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, আমরা শুধু মানুষের দোষ তালাশ করে বেড়াই, নিজের দোষ দেখতে অভ্যস্ত নয়।

---

[46] মাজমুয়ে ফাতওয়া: ৫১২/১০.

সালেহীনদের দ্বীনদারির কতক দৃষ্টান্ত

আমরা আমাদের পূর্ব মনীষীদের তাকওয়া ও দ্বীনদারি বিষয়ে জানার মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করতে পারি। পূর্ব মনীষীদের ঘটনা জানা দ্বারা মানুষের অন্তর নরম হয় এবং তারা হককে কবুল করতে অভ্যস্ত হয়। এ কারণেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কাফেরদের নিকট পূর্বের নবী ও রাসূলদের ঘটনা তুলে ধরেন। নবী ও রাসূলদের বিরোধিতা করার পরিণতি এবং তাদের আনুগত্য করার সুফল কি তা আলোচনা করেন, যাতে মানুষ তাদের ঘটনা থেকে উপদেশ গ্রহণ করে। আমরা এখানে আমাদের সালফে সালেহীনদের দ্বীনদারীর কতক দৃষ্টান্ত আলোচনা করব, যাতে আমরা আমাদের নিজেদের জীবনে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরহেজগার ও দ্বীনদার হতে পারি।

আমাদের সালফে সালেহীনদের মধ্যে অনেকেই দ্বীনদারির গুণে গুণান্বিত ছিলেন। কিন্তু তা স্বত্বেও তারা কখনোই নিজেদের পরহেজগার হিসেবে দাবি করতেন না। বরং, তারা তাদের থেকে এ ধরনের কোন গুণকে প্রত্যাখ্যান করতেন। কারণ, তারা জানতেন পরহেজগার হওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ; পরহেজগার হতে হলে অনেক সাধনা করতে হয় এবং অনেক কষ্ট সাধন করতে হয়।

আল্লামা শাবী রহ. বলতেন, হে ওলামাদের দল! হে ফকীহদের দল! তোমরা মনে রাখবে- আমরা আলেম কিংবা ফকীহ কোনটাই নই, বরং আমরা হলাম এমন সম্প্রদায়ের লোক, যারা একটি হাদিস শুনেছি তারপর আমরা যা শুনলাম তা তোমাদের নিকট বর্ণনা করলাম। ফকীহতো সে ব্যক্তি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন, তা

হতে বিরত থাকে। আর আলেমতো সে ব্যক্তি যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে।

চিন্তা করে দেখুন, আল্লাম শাবির মত এমন একজন মহা মণীষি সে তার নিজের ব্যাপারে কি ধরনের চিন্তা করেন এবং মানুষকে তাদের সম্পর্কে কি জানিয়ে দেন[47]।

নীচে তোমাদের জন্য আমাদের সালফে সালেহীনদের তাকওয়া ও দ্বীনদারির কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল:

পূর্বেকার উম্মতদের দ্বীনদারির দৃষ্টান্ত:

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجلٍ عَقارًا لَهُ، فَوجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيها ذَهبٌ، فَقالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَى العَقَارَ :خُذ ذهَبَكَ مِنِّي، إنّما اشْتَرِيُت مِنكْ الأرَض، ولَم أَبْتَعْ مِنكْ الذَّهَبَ .فَقَالَ الَّذِي شَرَى الأَرْضَ :إنّمَا بعِتُكَ الأرَضَ وَمَا فِيهَا- .فكل منهما تورع عن أخذ الذهب -قَالَ :فَتَحَاكَمَا إلَى رَجُلٍ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ :أَلَكُمَا وَلَدٌ؟ فَقَالَ أَحَدُهمَا :لِي غُلَامٌ .وَقَالَ الآخَرُ :لِي جَارِيَةٌ .قَالَ : أَنْكحِوا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِكمَا مِنُه، وتَصَدقَا»

অর্থ, একলোক কোন এক ব্যক্তি থেকে একটি জমিন ক্রয় করল, তখন যে ব্যক্তি জমি ক্রয় করল, সে তার জমি একটি স্বর্ণের থলি পেল, তখন

[47] [47] হুলিয়াতুল আওলিয়া ৩১১.

সে জমির পূর্বের মালিককে বলল, তুমি তোমারা স্বর্ণে থলি আমার থেকে নিয়ে যাও। আমি তোমার থেকে শুধু জমি ক্রয় করছি তোমার থেকে স্বর্ণ ক্রয় করিনি। তখন যে মালিক জমি বিক্রি করল, সে বলল, আমি তোমার নিকট জমি ও জমিনে যা কিছু আছে সবই বিক্রি করছি। তারা উভয়ে স্বর্ণের থলিটি গ্রহণ করা হতে বিরত থাকে। কেউ গ্রহণ করতে রাজি হয় না। তারপর তারা উভয়ে অপর এক ব্যক্তির নিকট বিচারের জন্য গেল। তখন লোকটি তাদের উভয়কে জিজ্ঞাসা করে বলল, তোমাদের উভয়ের ছেলে মেয়ে আছে কি? তখন তাদের একজন বলল, আমার একজন ছেলে আছে আর অপরজন বলল, আমার একজন মেয়ে আছে। তখন লোকটি বলল, তোমরা তোমাদের ছেলে মেয়েদের একে অপরের নিকট বিবাহ দিয়ে দাও। আর এ স্বর্ণ হতে তোমরা তোমাদের জন্য খরচ কর এবং তাদের বিবাহের মোহরানা পরিশোধ কর[48]।

এখানে তাদের উভয়ের দ্বীনদারির দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, তারা কিভাবে দুনিয়ার লোভকে সামাল দিতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে যদি এ ধরনের কোন ঘটনা আমাদের সামনে পেশ করা হত তাহলে আমাদের অবস্থা কি হত? আমরা কি আমাদের লোভকে সামাল দিতে পারতাম। একেই বলে পরহেজগারি ও দ্বীনদারি।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

« أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كَخ، كَخ ليَطْرَحها، ثُمَّ قَالَ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ »

---

[48] বুখারি ৩৪৭২, মুসলিম ১৭৬১.

হাসান ইবনে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সদকার মালামাল থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা দেখে সাথে সাথে বলল, ওয়াক ওয়াক!! যাতে সে তার মুখে নেয়া খেজুরটি বমি করে ফেলে। তারপর তিনি হাদিস শোনালেন, তুমি কি জান না, আমরা সদকা খাই না[49]।

আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِد التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي، فَأَرْفعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا »

আমি অনেক সময় আমার স্বীয় বিছানায় গিয়ে দেখতে পাই, আমার বিছানার উপর খেজুর পড়ে আছে। তারপর আমি তা খাওয়ার জন্য উঠাইতাম। কিন্তু যখন মুখের নিকটে নিতাম, তখন আর খেতাম না, না খেয়ে ফেলে দিতাম। আমি আশঙ্কা করতাম, না জানি তা কোন সদকার খেজুর![50]

---

[49] বুখারি ১৪৯১, মুসলিম ১০৬৯.

[50] বুখারি ২৪৩৩, মুসলিম ১০৭০

সাহাবীদের দ্বীনদারি:

আবু ক্বাতাদা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كنا مع النبي بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت فإذا حمار وحش، فوقع سوطي، فقالوا :لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة، فعقرته فأتيت به أصحابي، فقال بعضهم :كلوا .وقال بعضهم :لا تأكلوا .فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامنا -فسألته، فقال كُلوُه، حلَالٌ»

“আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে কা-হা নামক স্থানে ছিলাম। তখন আমাদের মধ্যে কিছু লোক ছিল মুহরিম আবার কিছু ছিল হালাল। এ অবস্থায় আমরা দেখতে পেলাম আমরা সাহাবীরা একটি জিনিষ দেখাদেখি করছে। তারপর আমি তাদের দিকে তাকিয়ে দেখি একটি দড়ি ছুট গাধা। তারপর আমার লাঠি জমিনে পড়ে গেল, তখন তারা বলল, আমরা কোন ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করব না। কারণ, আমরা সবাই ইহরাম বাধা অবস্থায় আছি। তারপর আমি নিজেই তা উঠিয়ে নেই। তারপর আমি একটি পর্দার আড়াল দিয়ে গাধার নিকট আসি এবং গাধাটিকে শিকার করি। তারপর জবেহ করে গোশত নিয়ে আমার সাথীদের নিকট আসি। তখন তাদের কেউ কেউ বলল, তোমরা খাও। আবার কেউ কেউ বলল, তোমরা খেয়ো না। তারপর আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে আসলাম-তিনি আমাদের সামনে ছিলেন- তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, আমরা কি এ

গাধা থেকে খাব নাকি খাব না? তখন তিনি বললেন, তোমরা তা হতে খাও। কারণ, তা তোমাদের জন্য হালাল”[51]।

অর্থাৎ, আবু কাতাদাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর লাঠি মাটিতে পড়ে গেলে সে তার নিজের লাঠি নিজেই মাটি থেকে উঠাইলেন। কোন সাহাবী তার লাঠিটা তার হাতে তুলে দেয়নি। কারণ, তারা আশঙ্কা করছিল যদি আমরা তার লাঠিটি তার হাতে তুলে দিই, তাহলে মুহরিম অবস্থায় তাকে শিকার করার জন্য সহযোগিতা করা হল। কারণ, সাহাবীরা তখন মুহরিম ছিল আর আবু কাতাদাহ ছিল গাইরে মুহরিম বা হালাল। তারপর সাহাবীরা আবু কাতাদাহ কর্তৃক শিকার করা গাধার গোশত খেতেও পরহেজ করেন। কারণ, তারা চিন্তা করছিল আবু কাতাদাহ শিকার করার প্রতি মনোযোগী হত না যদি তারা তার প্রতি দেখাদেখি না করত। তারা যখন দেখাদেখি করলেন তখন আবু কাতাদাহ গাধাটিকে শিকার করতে উদ্বুদ্ধ হল। এ কারণে তারা গোশত খেতে চাইছিল না। তারা ধারণা করছিল মুহরিম অবস্থায় শিকারির গোশত খাওয়া যাবে না।

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর দ্বীনদারি:

আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর তাকওয়া ও দ্বীনদারির স্থান আকাশচুম্বী। তার তাকওয়া ও দ্বীনদারি একেবারে চূড়ান্ত পৌঁছেছিল। নবী ও রাসূলদের পর তার স্থান সমগ্র মানুষের শীর্ষে। তার সমকক্ষ আর কেউ হতে পারবে না।

---

[51] বুখারি ১৮২৩.

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«كان لأبي بكر رضي الله عنه غلام يخرج له الخراج، وكان أبو بكر رضي الله عنه يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر رضي الله عنه ، فقال له الغلام :تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: رضي الله عنه وما هو؟ قال :كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أُحسِنُ الكهانة إلا أني خدعته، فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاء كل شيء في بطنه»

আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু একজন গোলাম ছিল, সে তার ট্যাক্স আদায় করত। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার ট্যাক্স থেকে আহার করত। একদিন সে কিছু জিনিষ নিয়ে আসলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তা হতে খেলেন। খাওয়ার শেষ হলে, গোলামটি আবু বকরকে বলল, তুমি কি জান এ গুলো কি জিনিষ? তখন আবু বকর তাকে বলল, কি জিনিষ? তখন সে বলল, আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে একজন লোককে ঝাঁড়-ফুক করি। কিন্তু আমি ভালোভাবে ঝাঁড়-ফুক কিভাবে করে জানতাম না, কিন্তু আমি তাকে ধোঁকা দিতাম। আমি তার সাথে দেখা করলে সে আমাকে এ জিনিষগুলো দেয়। আর আপনি তা হতেই এখন আহার করলেন। তার কথা শোনে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সাথে সাথে তার হাতকে তার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে যা কিছু খাইলেন সবই বমি করে দিলেন[52]।

[52] বুখারি: ৩৮৪২.

ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এর তাকওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবন ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণিত তিনি তার পিতা ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু হতে বর্ণনা করে বলেন,

«كان فرض للمهاجرين الأولين أربعة آلاف في أربعة، وفرض لابن عمر رضي الله عنه ثلاثة آلاف وخمسمائة، فقيل له :هو من المهاجرين فلم نقصته من أربعة آلاف؟ قال :إنما هاجر به أبواه .يقول :ليس هو كمن هاجر بنفسه »

ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু প্রথম যুগের মুহাজিরদের জন্য চার হাজার করে হিস্সা নির্ধারণ করেন। আর তিনি আব্দুল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জন্য নির্ধারণ করেন তিন হাজার পাঁচশ। তখন তাকে বলা হল, তিনিতো প্রথম যুগে যারা হিজরত করছে তাদের মধ্যে একজন। সে হিসেবে সে আমাদের সমান পায়। আপনি তাকে চার হাজার থেকে পাঁচশ কমালেন কেন? উত্তরে ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, সে তার মাতা পিতার সাথে হিজরত করেছে। সুতরাং, সে তাদের মত হবে না, যারা নিজের থেকে হিজরত করছিল[53]।

কারণ, আব্দুল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ছোট ছিলেন, তাই তাকে তার মাতা-পিতা উভয়ে হিজরত করান। এ কারণে তাকে যারা ইসলামের প্রথম যুগে হিজরত করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করেননি।

সালাবাহ ইবনে আবি মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন,

---

[53] বুখারি: ৩৯১২.

إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروطا بين نساء من نساء المدينة، فبقي مرط جيد، فقال له بعض من عنده :يا أمير المؤمنين، أعط هذا ابنة رسول الله التي عندك .يريدون أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه - لأنها حفيدة النبي فقال عمر رضي الله عنه: أم سليط أحق .وأم سليط من نساء الأنصار ، قال عمر :رضي الله عنه فإنها كانت تزفر لنا القرب ، ممن بايع رسول الله يوم أحد .تزفر :تخيط.

ওমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহু মদিনার নারীদের মধ্যে কিছু কাপড় বিতরণ করেন। বিতরণের পর একটি ভালো কাপড় অবশিষ্ট থেকে গেলে তার নিকট উপস্থিত কেউ বলল, হে আমীরুল মুমিনিন! এ কাপড়টি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতনী উম্মে কুলসুম বিনতে আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কে দিয়ে দিন। কারণ, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতনী। এ কথা শোনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বললেন, উম্মে সুলাইত তার চেয়েও অধিক হকদার। উম্মে সুলাইত হল আনসারি নারী, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আরও বলেন, উম্মে সুলাইত ওহুদের যুদ্ধে আমাদের জন্য পানির মশক সিলাই করতো[54]।

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু কাপড়টি তার স্ত্রীকে দান করতে অস্বীকার করেন। অথচ সে ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাতনী। কারণ, তার স্থান উম্মে কুলসুমের নীচে।

[54] বুখারি: ২৮৮১.

জয়নাব বিনতে জাহাসের দ্বীনদারি:

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর অপবাদের ঘটনায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জয়নব বিনতে জাহাস রাদিআল্লাহু আনহা কে তার দ্বীনদারির কারণে হেফাজত করেন। মুনাফেকরা যখন আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহার ব্যাপারে বিপথগামী হলেন এবং তাদের সাথে অন্যান্য লোকেরাও তাদের কথার আলোচনা করতে আরম্ভ করেন, তখন যয়নব বিনতে জাহাস রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর সতিন হওয়া এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা এর উপর নিজের বড়ত্ব প্রকাশ ও আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর প্রতি তার বৈরিতা থাকা স্বত্বেও আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা সম্পর্কে কোন খারাপ মন্তব্য করেননি। যখন তাকে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, তখন তিনি বললেন, আমি তার সম্পর্কে ভাল জানি। তার মধ্যে আমি কখনো কোন খারাপী দেখি নাই। তিনি এ ঘটনায় নিজেকে জড়ানো হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন।

আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা নিজেই জয়নাব বিনতে জাহাস সম্পর্কে বর্ণনা দিয়ে বলেন,

«كان رسول الله يسأل زينب بنت جحش رضي الله عنها عن أمري، فقال يَا زَينبَ، مَا عَلِمتِ؟ مَا رَأَيْتِ فقالت :يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا .قالت :وهي التي كانت تساميني، فعصمها الله بالورع»

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সম্পর্কে জয়নাব বিনতে জাহাস রাদিআল্লাহু আনহার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, তিনি বলেন, হে

জয়নব তুমি তার সম্পর্কে কি জান এবং কি দেখছ? তখন জয়নব বিনতে জাহাস রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাসূল! আমি আমার চোখ ও কানকে হেফাজত করে বলছি। আমি তার সম্পর্কে একমাত্র ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আয়েশা রাদিআল্লাহু আনহা বলেন, তিনিই আমার উপর বড়াই করতেন। কিন্তু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার দ্বীনদারি দ্বারা তাকে হেফাজত করেন[55]।

এ ধরনের ঘটনা আমাদের সমাজেও সংঘটিত হয়। যখন এ ধরনের কোন ঘটনা দেখা যায়, তখন আমাদের উচিত হল চুপ থাকা। কোন প্রকার সাক্ষী ছাড়া এ ধরনের রটনা সম্পর্কে মন্তব্য করা খুবই খারাপ।

আমাদের দেশে দেখা যায় সতীনকে বরদাশত করতে পারে না। তার কোন দোষ-ত্রুটি প্রকাশ পাওয়ার সাথে তাকে কিভাবে অপমান করা যায় সে চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী ছিল দুনিয়ার সমস্ত মহিলাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এত বড় একটি সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের সতীনের বিষয়ে কোন খারাপ মন্তব্য করাতো দূরের কথা, বরং তিনি সাথে সাথে বললেন, না, হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর রাসূল! আমরা তার মধ্যে কখনো কোন খারাপ অভ্যাস প্রত্যক্ষ করিনি। তার মধ্যে আমরা সব সময় ভালো গুণই দেখতে পেতাম। এ ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রীদের অবস্থা; তারা তাদের নিজেদের স্বার্থের কারণে কখনো দ্বীনদারির পরিপন্থী কোন কথা বা কাজে জড়িত হত না।

---

[55] বুখারি ২৬৬১, মুসলিম ২৭৭০।

ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর তাকওয়া:

আব্দুল্লাহ ইবন ওমরের শিষ্য নাফে রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বর্ণনা করেন,

« سمع ابن عمر رضي الله عنه مزماراً، قال : فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي :يا نافع، هل تسمع شيئاً؟ قال :فقلت: لا. قال :فرفع إصبعيه من أذنيه »

অর্থ: একবার আব্দুল্লাহ ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু গানের আওয়াজ শুনল। গানের আওয়াজ শোনার পর সে তার দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে প্রবেশ করে। তারপর সে খুব দ্রুত রাস্তা অতিক্রম করে। তারপর ইবনে ওমর আমাকে বলল, হে নাফে! তুমি কি কিছু শুনতে পেয়েছ? তিনি বলেন, আমি তাকে বললাম না, আমিতো কিছু শুনতে পাচ্ছি না। আমার কথা শোনার পর সে তার কর্ণদ্বয় থেকে আঙ্গুল বের করে আনল[56]।

তাবেয়ীনদের তাকওয়া:

আব্দুর রহমান ইবন ওসমান রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা এহরাম অবস্থায় তালহা ইবন উবাইদুল্লা সাথে ছিলাম, তখন আমাদের জন্য একটি পাখি হাদিয়া স্বরূপ প্রেরণ করা হল। আমাদের মধ্য হতে কেউ কেউ তা হতে আহার করল, আবার কেউ কেউ না খেয়ে থাকল এবং দ্বীনদারি অবলম্বন করল। ফলে

---

[56] আবু দাউদ ৪৯২৪, ইমাম আহমদ: ৪৫৩৫, আলবানি রহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

অনেকেই তা থেকে একটুও খেল না। তারপর যখন তালহা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ঘুম থেকে উঠল, তখন সে যারা খেয়েছে তাদের সাথে একমত হন এবং তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে এ ধরনের পাখির গোশত খেয়েছি।

মোটকথা, এখানে দেখা গেল, কতক তাবে‘ঈ পাখির গোশত খেল না। তারা দ্বীনদারি অবলম্বন করল। তাদের দ্বীনদারি তাদের খাওয়া হতে বিরত রাখল।

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. এর তাকওয়া:

হাসান ইবন আরফা রহ. আব্দুল্লাহ ইবন মুবারকের সূক্ষ্ম বিষয়ে যে তাকওয়া অবলম্বন করতেন, তার বর্ণনা করে বলেন, তিনি একদিন শামের এক লোক হতে একটি কলম ধার নেন, কিন্তু পরবর্তীতে তিনি ভুলে গিয়ে তা খোরাসানে নিয়ে আসেন। তারপর যখন সে কলমটি হাতে পান, সাথে সাথে সে পুনরায় শামে চলে আসেন এবং কলমটিকে তার প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছে দেন।

একটি কলমের জন্য তিনি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবার সিরিয়ায় যান। আর বর্তমানে আমরা মানুষের হকের প্রতি কোন গুরুত্বই দিই না। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত থাকি। অথচ দাবি করি আমি একজন মুত্তাকী ও পরহেজগার।

এ ধরনের অসংখ্য ও অগণিত ঘটনা আছে, যেগুলো বর্ণনা করে শেষ করা সম্ভব নয়। তবে যারা জ্ঞানী তাদের জন্য দু-একটি ঘটনাই

উপদেশ গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট। কারণ, প্রবাদে আছে “জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট”।

আর যারা জ্ঞানী নয়, তাদের জন্য যদি হাজারো ঘটনা উল্লেখ করা হয় তা তাদের কোন উপকারে আসবে না।

দ্বীনদারি অবলম্বন করার উপকারিতা

দ্বীনদারির উপকারিতা অনেক। একজন পরহেজগার লোক দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে কামিয়াবি লাভ করবেন। দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের মধ্যে তার কবুলিয়ত দান করবে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে মহব্বত করবে। যখন কোন বান্দাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মহব্বত করে তার ফেরেশতারাও মহব্বত করে এবং জমিনে অধিবাসীরাও তাকে মহব্বত করে। এছাড়াও একজন পরহেজগার লোককে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার নূরের আলো দ্বারা আলোকিত করবে।

দ্বীনদারি অবলম্বন করা সফলতার কারণ:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴾

অবশ্যই সাফল্য লাভ করবে যে আত্মশুদ্ধি করবে, [সূরা আলা, আয়াত: ১৪] আল্লামা ক্বাতাদাহ রহ. বলেন, মুত্তাকী হিসেবে আমল করল[57]।

মুসা ইবন হাম্মাদ রহ. বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরী রহ. কে স্বপ্নে দেখি সে জান্নাতে এক গাছের ডাল থেকে অপর গাছের ডালে এবং এক গাছ থেকে আরেক গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ অবস্থা দেখে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আবু আব্দুল্লাহ! তুমি এ ধরনের মান-মর্যদা ও

---

[57] তাফসীরে তাবারী: ৫৪৬/১২

সম্মান কিভাবে অর্জন করলে? উত্তরে সে বলল, দ্বীনদারি মাধ্যমে, দ্বীনদারি মাধ্যমে[58]। কথাটি সে দুইবার বলল।

দ্বীনদারি কিয়ামতের দিন হিসাব সহজ হওয়ার কারণ:

সুফিয়ান রহ. বলেন, তুমি দুনিয়া বিমুখ হও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাকে দুনিয়ার সব দুর্বলতা প্রদর্শন করবে। আর তুমি দ্বীনদারি অবলম্বন কর, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমার থেকে হিসাব নেয়া সহজ করে দেবে।

যারা দ্বীনদারি অবলম্বন করেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের দুনিয়াতেও সুখী জীবন দান করেন এবং আখেরাতেও তাদের হিসাবকে সহজ করে দেবে[59]।

দ্বীনদারি কারণে আমলে বরকত হয় এবং ছাওয়াব বেশি পাওয়া যায়:

ইউসূফ ইবন আসবাত রহ. বলেন, অধিক আমল করা হতে সামান্য তাকওয়া অর্জন করা যথেষ্ট[60]।

এক ব্যক্তি আবি আব্দুর রহমান আল-আমরিকে বলল, তুমি আমাকে ওয়াজ কর! এ কথা শোনে জমিন থেকে একটি পাথর নীল এবং বলল, এ পাথরের টুকরা পরিমাণ তাকওয়া তোমার অন্তরে প্রবেশ করা সমগ্র

---

[58] ইবনে আবিদ-দুনিয়া, মানামাত: ২৭৫

[59] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২০/৭ ইবনে আরবীর যুহুদ ও যাহিদিনদের বর্ণনা ৬৩

[60] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২৪৩/৮.

জমিন বাসীর সালাত হতে উত্তম। অনেক মানুষ আছে যারা সালাত আদায় করতে করতে কপালে দাগ পালায়। কিন্তু তাদের ইবাদতে কোন এখলাছ নাই। তাদের এ ধরনের ইবাদত নিষ্ফল ও অকার্য। এ দিয়ে তারা আখিরাতের জীবনে নাজাত পেতে পারবে না। সুতরাং একটি কথা মনে রাখতে অধিক ইবাদত মানুষের জন্য কোন কল্যাণ ভয়ে আনতে পারে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনুকরণ ও আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সন্তুষ্টি লাভের জন্য সামান্য ইবাদতই যথেষ্ট[61]।

দ্বীনদারি নিয়ত সংশোধনের কারণ:

বিলাল ইবন সায়াদ রহ. বলেন, মুমিনের তাকওয়া ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়বে না যতক্ষণ না সে কি নিয়ত করে তা দেখে নেবে। যখন কোন বান্দার নিয়ত ঠিক হবে, তখন তার পরবর্তী সব আমল ঠিক হবে। আর যদি নিয়ত ঠিক না থাকে, তখন তার আমলও ঠিক থাকবে না। এ কারণেই বলা হয়, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মানুষের বাহ্যিক দিক দেখেন না, তিনি দেখেন মানুষের অন্তর ও নিয়ত। যখন মানুষের নিয়ত ভালো হবে তখন তার আমলও ভালো হবে। আর যখন নিয়ত ফাসেদ হবে তখন তাদের আমলও ফাসেদ হবে। এ কারণেই আমল শুদ্ধ করার পূর্বে অবশ্যই নিয়তকে শুদ্ধ করতে হবে। আর দ্বীনদারি অবলম্বন দ্বারা মানুষের নিয়ত শুদ্ধ হয়ে থাকে।

---

[61] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২৩০/৫.

দ্বীনদারি সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বিরত রাখার কারণ:

আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনতাকী রহ. বলেন, যে ভয় করে সে ধৈর্য ধারণ করে, আর যে ধৈর্য ধারণ করে সে দ্বীনদারি অবলম্বন করে এবং যে দ্বীনদারি করে সে সুবহাত থেকে বিরত থাকে[62]। সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে তারা বেচে থাকে যারা ঈমানের দিক দিয়ে পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। যখন কোন বান্দার অন্তরে দ্বীনদারি থাকে তখন সে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করে। আর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভয় যে অন্তরে থাকবে, সে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মর্জি মোতাবেক চলতে চেষ্টা করবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মর্জি মোতাবেক চলার অর্থ হল, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মর্জির খেলাপ সব ধরনের কর্মকাণ্ড হতে বিরত থাকা।

দ্বীনদারি দোয়া কবুল হওয়ার কারণ:

আবু মুহাম্মদ ইবন ওয়াসে রহ. বলেন, দ্বীনদারির সাথে সামান্য দোয়াই যথেষ্ট যেমন খাওয়ার সাথে সামান্য লবণই যথেষ্ট হয়[63]। পরহেজগার লোকদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দরবারে অধিক দোয়া করতে হয় না। তারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দরবারে হাত তুললেই চলে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের কথায় সাড়া দেন।

---

[62] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২৯০/৯.

[63] শুয়াবুল ঈমান: ১১৪৯.

দ্বীনদারি ইলম অর্জন বা হাসিলের কারণ:

আব্দুল্লাহ ইবন মুবারক রহ. বলেন, চারটি বিষয় ছাড়া পরিপূর্ণ ইলম হাসিল করা যায় না। চারটি বিষয় হল, ইলম অর্জনের জন্য নিজেকে ফারেগ করা। দুই- টাকা-পয়সা। তিন-স্মরণ শক্তি। চার- তাকওয়া বা দ্বীনদারি[64]।

দ্বীনদারি ইলমের মধ্যে বরকতের কারণ:

আল্লামা কানুজি রহ. বলেন, একজন আলেমের জন্য জরুরি হল তাকওয়া ও দ্বীনদারি। যখন একজন আলেমের মধ্যে তাকওয়া বা দ্বীনদারি থাকবে তখন তার ইলমের ফায়েদা ও উপকারিতা বেশি হবে[65]। যখন কোন অন্তরে তাকওয়া থাকবে তখন সে অন্তরে ইলম স্থান করে নিবে। কিন্তু যে অন্তরে গুনাহ থাকবে, বিদআত থাকবে এবং জাহালত থাকবে সে অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর দ্বীনের ইলম বা নুর থাকতে পারে না। কারণ, ইলম হল, নুর। আর গুনাহ পাপাচার হল, অন্ধকার। আলো ও অন্ধকার একসাথে একত্র হতে পারে না। এ কারণেই যখন একজন বান্দা গুনাহ হতে বিরত থাকে তখন তার অন্তরে ইলম প্রবেশ করে। তার ইলম দ্বারা সে নিজে উপকৃত হয় এবং মানুষকে সে উপকার করতে সক্ষম হয়।

---

[64] শুয়াবুল ঈমান: ১৭৩২.

[65] আবজাদুল উলুম: ২৪৮/১.

তাকওয়া দ্বারা অপরের থেকে হক কবুল করার মানসিকতা তৈরি হয়:

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমি যখনই কোন মানুষের নফসের চাহিদার বিরোধিতা করি, তখন তাকে দেখতে পাই সে আমার উপর বিরক্ত হয়। বর্তমানে আসলে আহলে ইলম ও পরহেজগার লোকের খুব অভাব দেখা দিয়েছে[66]।

সত্যিকার অর্থে যারা আহলে ইলম বা পরহেজগার হয়, তারা কখনোই তাদের মতের বিরোধিতার উপর বিরক্ত বোধ করবে না। বরং তাদের যদি কেউ উপদেশ দেয়, তারা খুশি হয় এবং উপদেশ গ্রহণ করে।

দ্বীনদারি আত্মার পরিশুদ্ধির কারণ:

আত্মার সংশোধন অত্যন্ত জরুরি বিষয়। আত্মার সংশোধন ছাড়া মানুষ কখনোই পরহেজগার হতে পারে না। আর যখন মানুষ পরহেজগার হবে না তখন তাকে পদে পদে বিপদে পড়তে হবে। তবে মানুষ যখন পরহেজগার হয়, তখন সে অন্যের সংশোধনের পূর্বে নিজের সংশোধন নিয়েই অধিক ব্যস্ত হয়। একজন মানুষের দ্বীনদারি তার নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধনের কারণ হয়ে থাকে। মানুষ যখন পরহেজগার হয়, তার মধ্যে কোন প্রকার হিংসা, বিদ্বেষ ও অহংকার থাকে না। ইব্রাহীম ইবন দাউদ ইবন সাদ্দাদ রহ. বলেন,

وَالْمَرْءُ إِنْ كَانَ عَاقِلًا وَرِعاً

---

[66] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৯/৭.

أَخرسَهُ عَنْ عُيوبِهِمْ وَرعُهْ

كَمَا السَّقِيُم المَرِيضُ يُشْغِلُهُ

عَنْ وَجَعِ النأَّسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهْ

"যদি কোন মানুষ জ্ঞানী ও মুত্তাকী হয়, তার তাকওয়া তাকে মানুষের দোষ-ত্রুটি নিয়ে মন্তব্য বা সমালোচনা করা হতে বোবা বানিয়ে দেয়। যেমন, একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে তার ব্যথা-বেদনা অন্যান্য লোকের ব্যথা বেদনা নিয়ে চিন্তা করা হতে বিরত রাখে[67]। পরহেজগার সব সময় তার নিজের কোন ভুল ত্রুটি হচ্ছে কিনা এ নিয়ে পেরেশান থাকে। নিজেকে সঠিক ও সৎ পথে পরিচালনার জন্য ব্যস্ত থাকে। অন্যের বিষয়ে চিন্তা করা ও মাথা গামানোর সুযোগ তার খুব কম থাকে।

দ্বীনদারির চরিত্র সুন্দর করার কারণ:

চরিত্র সুন্দর করা অতীব জরুরী বিষয়। যার চরিত্র সুন্দর তার মত সুন্দর মানুষ দুনিয়াতে আর কেউ হতে পারে না। সুন্দর চরিত্র মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সুন্দর চরিত্রের কারণে মানুষের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। মানুষ তাকে তাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। সুন্দর চরিত্র হাসিলের জন্য দ্বীনদারি অবলম্বন করতে হয়। পরহেজগার লোকের চরিত্র সুন্দর হয় এবং তারা কোন নোংরা কাজ করে না। আল্লামা আব্দুল করিম আল-জাযারি রহ. বলেন, একজন পরহেজগার

[67] ইবনে আবিদ-দুনিয়া, আল-ওয়ারয়ু: ২১৮.

লোক কখনোই ঝগড়া-বিবাদ করে না[68]। তারা মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করে।

কোন সমাজে একজন পরহেজগার লোক থাকলে সে মানুষের আশ্রয় কেন্দ্রে পরিণত হয়। লোকেরা তার কাছে বুদ্ধি পরামর্শের জন্য যায়। বিপদ আপদে তার থেকে পরামর্শ নেয়। তাকে সমাজের আমানতদার হিসেবে মেনে নেয়। তার কাছে তারা তাদের টাকা পয়সা আমানত রাখে। যাবতীয় গোপন বিষয় তার কাজে বলে। দু:খ, দুর্দশা ও হতাশার সময় তার সান্নিধ্যে এসে সময় কাটায়।

দ্বীনদারি অবলম্বন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জনের কারণ:

একজন লোক তখন কামিয়াব হবে, যখন দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি লাভে সে ধন্য হয়। দুনিয়া ও আখিরাতে সৌভাগ্য লাভ করার জন্য একজন মানুষকে অবশ্যই তাকওয়া বা দ্বীনদারি অর্জন করতে হবে। ফুজাইল ইবন আয়ায রহ. বলেন, পাঁচটি জিনিষ সৌভাগ্য লাভের কারণ: অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস। দ্বীনের বিষয়ে দ্বীনদারি অবলম্বন করা, দুনিয়া হতে বিমুখ হওয়া, লজ্জা করা এবং জ্ঞান অর্জন করা[69]।

এখানে যে পাঁচটি বিষয়ের কথা আলোচনা করা হয়েছে, এগুলো খুবই জরুরি। যখন মানুষের ঈমান মজবুত হবে না, তখন তার যাবতীয় সব কর্মে হতাশা বিরাজ করবে। কোন কাজেই সে সাহস ও শক্তি পাবে না। আর যখন একজন মানুষের ঈমান মজবুত হবে, তখন তাকে কোন

---

[68] শুয়াবুল ঈমান: ৮৪৮৯.

[69] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২১৬.

কিছুই পরাহত করতে পারবে না। যে যত বেশি বিশ্বাসী হবে, সে তত বেশি শক্তিশালী হবে।

আর দ্বীন হল, মানব প্রকৃতির সাথে সরাসরি জড়িত একটি বিধান। যারা দ্বীনকে মানবে তারা তাদের মানবতাকে সহযোগিতা করবে। আর যারা দ্বীনকে মানবে না, তারা মানবতার শত্রু ও বিরোধী। তারা কোন কাজেই সফলতা পাবে না।

দুনিয়া হল, মানুষের জন্য পরীক্ষাগার। এখানে কেউ চিরদিন থাকতে পারবে না। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী জীবন, আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন একেবারেই নগণ্য। এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়। কিন্তু তারপরও এ দুনিয়া নিয়ে আমরা এত ব্যস্ত থাকি, তা আর বলে বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। যারা রাতদিন সবসময় দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা কখনোই পরহেজগার হতে পারে না। দুনিয়া ও আখিরাত দুটি এক সাথে কামাই করা যায়না। যারা দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তারা তাদের আখিরাতের ক্ষতি করে। আর যারা আখেরাত নিয়ে ব্যস্ত থাকে তারাও দুনিয়ার কাজ কর্মে অমনোযোগি হয়।

লজ্জা মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূষণ। যাদের লজ্জা থাকে না, তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে। পক্ষান্তরে যাদের মধ্যে লজ্জা থাকে, তারা ইচ্ছা করলে যা ইচ্ছা তা করতে পারে না। তাদের লজ্জা তাদের বাধা দেয়। এ কারণেই হাদিসে বলা হয়েছে, লজ্জা ঈমানের একটি অন্যতম শাখা। লজ্জার সাথে ঈমানের সম্পর্ক গভীর। লজ্জাহীন লোক কখনোই ঈমানদার হতে পারে না। যারা পরহেজগার হয়, তাদের মধ্যে অবশ্যই

লজ্জা থাকে। তারা মানবতা বিরোধী কোন কাজ করে না। তাদের লজ্জা তাদের বাধা দেয় এবং বিরত রাখে।

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, ইলম ছাড়া দ্বীনদারি অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, ইলম ছাড়া কোনটি হালাল আর কোনটি হারাম তা জানার কোন উপায় নাই। হারাম হালাল সম্পর্কে জানা ছাড়া কারো জন্য মুত্তাকী বা পরহেজগার হওয়া সম্ভব নয়।

আমরা কিভাবে পরহেজগার হতে পারি?

আমাদের সবারই পরহেজগার হওয়ার জন্য চেষ্টা করা উচিত। এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অনেক বড় নেয়ামত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যাকে এ নেয়ামত দান করেন তাকে দুনিয়া আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ দান করেন। এর গুরুত্ব অনুধাবন করে দ্বীনদারি লাভ করার চেষ্টা আমাদের সবারই করা উচিত। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সবাইকে এ নেয়ামত দান করেন না। তিনি তার বান্দাদের থেকে যাকে চান তাকেই দ্বীনদারি দান করেন। আর যাকে এ নেয়ামত দান করা হল, তার মত সৌভাগ্য দুনিয়াতে আর কারো হতেই পারে না। দ্বীনদারি লাভের কতক কারণ আছে যেগুলো একজন বান্দাকে দ্বীনদারির মর্তবা পর্যন্ত পৌছতে সহযোগিতা করে।

এক. নিষিদ্ধ বস্তু থেকে দূরে থাকা:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যে সব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে দ্বীনদারি অর্জন করতে হবে। নিষিদ্ধ

বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকা দ্বীনদারি অর্জনের পূর্ব শর্ত। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহু বলেন,

اجتنب ما حرم عليك تكن من أورع الناس

"আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তোমাদের জন্য যা হারাম করেছে, তা হতে বিরত থাক, তাহলে তুমি বড় পরহেজগার হতে পারবে"[70]।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু 'আনহুর নিকট একজন লোক এসে কোন একটি বিষয়ে সাক্ষী দিল, তার কথা শোনে তিনি তাকে বলেন, আমি তোমাকে চিনি না। আর আমার না চেনা তোমার কোন ক্ষতি হবে না। তুমি একজন লোক নিয়ে আস যে তোমাকে চেনে। এ কথা শোনে উপস্থিত লোকদের একজন বলল, আমি তাকে চিনি। ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করল, তুমি তার সম্পর্কে কি জান? সে বলল, আমি জানি লোকটি ইনসাফগার ও দ্বীনদার। সে তোমার নিছক একজন প্রতিবেশী তুমি কি তার রাত-দিন এবং যাওয়া আসা সব বিষয়ে জান? তখন সে বলল, না। তুমি কি তার সাথে টাকা-পয়সার লেন-দেন করেছ? টাকা পয়সার লেন-দেন মানুষের দ্বীনদারির প্রমাণ। লোকটি বলল, না আমি তার সাথে টাকা পয়সার কোন লেন-দেন করি নাই। তারপর সে বলল, তুমি তার সাথে সফরের সঙ্গী হয়েছিলে? যা তার চরিত্র ভালো হওয়ার উপর প্রমাণ বহন করে। লোকটি বলল, না। আমি তার সাথে কখনো সফর করিনি। তখন তিনি বললেন, তুমি তার

---

[70] শুয়াবুল ঈমান: ২০১.

সম্পর্কে জান না। সুতরাং, তুমি একজন লোক নিয়ে আস যে তোমার সম্পর্কে জানে[71]।

সুফিয়ান সাওরী রহ. কে দ্বীনদারি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, উত্তরে তিনি বললেন,

إِنِّي وَجَدتُ فَلا تَظُنوُّا غَيْرَهُ

هَذَا التَّوَرُّع عِنْدَ هَذَا الدِّرْهَمِ

فإذِا قِدرْتِ عَلَيْهِ ثُمَّ تَرْكَتهُ

فَاعْلَمْ بأَنَّ هُنَاكَ تَقْوَى المُسْلِمِ

"মনে রাখবে, আমি দিরহামের নিকট দ্বীনদারিকে পেয়েছি, এর বাহিরে কোন কিছু তোমরা চিন্তা বা ধারণা করো না। যখন তুমি দিরহাম অর্জনে সক্ষম হও, কিন্তু তা তুমি গ্রহণ না করে রেখে দিলে এবং তার লোভকে তুমি সামাল দিলে, [এটিই হল, সত্যিকার দ্বীনদারি] তবে তুমি মনে রাখ! এখানেই একজন মুসলিমের তাকওয়া বা দ্বীনদারি প্রমাণিত হয়"[72]। [তার মধ্যে কি অর্থের লোভ বেশি না আখিরাতের প্রতি আগ্রহ বেশি]

অপর এক কবি কাব্য আবৃত্তি করে বলেন,

---

[71] সুনানুল বাইহাকি আল কুবরা: ২০১৮৭ আলবানী সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন।

[72] মুখতাছারু শুয়াবুল ঈমান: ৮৬.

لَا يَغُرَّنْكَ مِنَ المَرْءِ قَمِيصٌ رَقَعَهْ

أَوْ إِزَارٌ فَوْقَ كَعْبِ السَّاقِ مِنهُ رَفَعَهْ

أَو جَبِين لَاح فِيهِ أَثَّر قْد قَلَعَهْ

وَلَدَى الدِّرْهَمِ فَانُظرْ غَيَّهُ أَو ورَعَه

“যখন কোন মানুষকে তুমি ছিড়া জামা পরিধান করতে দেখবে, তাকে তুমি বুজুর্গ বা পরহেজগার মনে করে ধোঁকায় যেন না পড়। অনুরূপভাবে যখন তুমি কোন মানুষকে যখন দেখবে সে গোড়ালির উপর কাপড় পরিধান করে, তখন তাকে তুমি পরহেজগার ধারণা করে, অথবা তার চেহারার মধ্যে এমন কোন আঘাত রয়েছে যা তার দ্বীনদারি বুঝায়, তা দেখে তুমি যেন ধোঁকায় না পড়। তোমাকে একজন মানুষের দ্বীনদারি পরীক্ষা করতে হলে, দেখতে হবে টাকা পয়সা যখন তার সামনে রাখা হয়, তখন সে তাকে কিভাবে গ্রহণ করে। তখন তার দ্বীনদারি প্রাধান্য পায় নাকি তার গোমরাহি[73]!

দুই. আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছোট বড় যাবতীয় কর্মের উপর হিসাব নিবে এ কথা স্মরণ করা।

আবুল আব্বাস ইবন আতা রহ. বলেন,

---

73 এহইয়ায়ু উলুমুদ্দিন: ৮২/২.

পরহেজগার লোকদের দ্বীনদারি সৃষ্টি হয়, শস্য দানা ও অনুকণাকে স্মরণ করার মাধ্যমে। তাকে জানতে হবে, আমাদের রব যিনি আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি ভালো ও মন্দ কর্ম বিষয়ে হিসাব নেবেন। তিনি আমাদেরকে হিসাবের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ছাড় দেবেন না এবং আমাদের হিসাবে কঠোরতা করবেন। তার চেয়ে আরও কঠিন ব্যাপার হল, সে তার বান্দাদের থেকে অনুকণা পরিমাণ ও শস্য দানার ওজনের সম-পরিমাণ বিষয়েও হিসাব নেবেন। সুতরাং যে বান্দার হিসাবের এ অবস্থা হবে তাকে অবশ্যই হিসাব দেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেদিন আমাদের যাবতীয় কর্মের হিসাব নিবেন সেদিনের জন্য প্রস্তুত হতে হলে আমাদের অবশ্যই দুনিয়াতে পরহেজগার হতে হবে। হালাল হারাম বেছে চলতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর আদেশ নিষেধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে[74]। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিধান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করতে হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাতের অনুকরণ ও অনুসরণ করতে হবে। যাবতীয় সব কর্মে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে নাজির জানতে হবে। আমাদের একদিন আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে হিসাবের জন্য দাঁড়াতে হবে এ কথা চিন্তা করে যাবতীয় সব কর্ম সম্পাদন করতে হবে।

---

[74] শুয়াবুল ঈমান: ২৭০.

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করা:

আবু আব্দুল্লাহ আল-ইনতাকী রহ. বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করার মাধ্যমে তাকওয়া অর্জন হয়[75]। যার অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় থাকে, সে কখনোই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা নিষেধ করেছেন তার কাছেও যেতে পারে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর ভয় হল, দ্বীনদারি মূল ভিত্তি। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করার মাধ্যমে দ্বীনদারি অর্জন করা যায়। পক্ষান্তরে যার মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয় থাকে না সে কখনোই পরহেজগার হতে পারবে না।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সাক্ষাতে ইয়াকীন করা এবং মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করা:

ইয়াহইয়া ইবন মায়ায রহ. বলেন, তিনটি অভ্যাসের চর্চা দ্বারা দ্বীনদারি অর্জন হয়: আত্ম-মর্যাদা, বিশুদ্ধ বিশ্বাস এবং মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার অনুভূতি[76]।

আত্ম-মর্যাদাবোধ মানুষকে অনেক অপরাধমুলক কাজ হতে বিরত রাখে। যাদের মধ্যে আত্ম-মর্যাদাবোধ আছে, তারা তাদের সম্মানহানি হয়, এমন কোন কাজ করে না। সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে তারা তাদের নিজেদের বিরত রাখে। তারা কোন কাজ করার পূর্বে অবশ্যই চিন্তা-ভাবনা করে থাকে।

---

[75] হুলিয়াতুল আওলিয়া ২৯০/৯.

[76] হুলিয়াতুল আওলিয়া ৬৮/১০.

বিশ্বাসের সাথে দ্বীনদারি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষের আমলের পরিবর্তন হয়ে থাকে। একজন মানুষ সে কাজটি করে যা সে বিশ্বাস করে। সুতরাং, মানুষের বিশ্বাসের শুদ্ধতা খুবই জরুরি। যখন বিশ্বাস শুদ্ধ হবে তখন তার আমলও শুদ্ধ হবে। আর বিশ্বাস যদি ফাসেদ হয় তখন তার আমলও ফাসেদ হবে।

মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত এ কথা কারোরই অজানা নয়। তবে মানুষ যখন মৃত্যুর কথা চিন্তা করে তখন তার অন্তর নরম হয় এবং দুনিয়ার প্রতি তার মহব্বত দুর্বল হয়। যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করবে, সে দুনিয়া বিমুখ হবে এবং আখিরাতমুখি হবে। তখন তার মধ্যে দ্বীনদারি অর্জন হবে।

সুন্নাতের অনুকরণ করা এবং বিদ‘আত পরিহার করা:

আল্লামা আওযায়ী রহ. বলেন, আমরা আমাদের যুগে এ আলোচনা করতাম যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিদআত বিষয়ে কথা বলত, তখন তার তাকওয়া ও দ্বীনদারি চিনিয়ে নেয়া হত[77]।

আবু মুজাফ্ফর আস-সামআনী রহ. আহলে কালামীদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, কোন কালামীকে আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি, তার কালাম ও তার চিন্তা-চেতনা তাকে দ্বীনের ব্যাপারে দ্বীনদারির দিকে নিয়ে গেছে অথবা তারা পারস্পরিক লেন-দেনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে ভয় করছে। অথবা চলার পথে তারা বক্রতাকে বাদ দিয়ে সঠিক পথ অবলম্বন করছে এবং দুনিয়ার মায়া ছেড়ে আখিরাতমুখি

[77] কালামীদের দূর্ণাম বিষয়ে হাদীসসমূহ: ১২৭.

হয়েছে, বা কোন হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে বিরত থাকছে। তারা তাদের ইবাদত বন্দেগীতে এখলাস বা একাগ্রতা অবলম্বন করার কোন দৃষ্টান্ত আজ পর্যন্ত দেখাতে পারেনি। আর তাদের কালাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি আনুগত্যটাকে বাড়িয়ে দিয়েছে অথবা তার কালাম তাকে কোন নাফরমানি বা অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখছে এ রকম কোন নজির তারা প্রমাণ করতে পারেনি[78]। এ ধরনের কালামী পাওয়া যায় না বললেই চলে। মোট কথা কালামীদের কাউকেই তাদের কালাম কোন উপকার করতে পারেনি। তবে দু-একজন হয়তো ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

ইলম অনুযায়ী আমল করা:

সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, যখন কোন মুমিন তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, তখন তার ইলম তাকে তাকওয়া ও দ্বীনদারির পথ দেখাবে। আর যখন সে দ্বীনদারি অবলম্বন করবে তখন তার অন্তর আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সাথে সম্পৃক্ত হবে। ইলম অনুযায়ী আমল করা দ্বীনদারি অর্জনের পূর্ব শর্ত। যারা তাদের ইলম অনুযায়ী আমল করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাদের জন্য হেদায়েতের পথ খুলে দেয়[79]।

---

78 আল-ইন্তিসার লি-আসহাবিল হাদীস: ৬৫.

79 হুলিয়াতুল আওলিয়া ২০৫/১০

দুনিয়া বিমুখ হওয়া:

মানুষকে দুনিয়াতেই বেঁচে থাকতে হয় এবং দুনিয়ার জীবন তাদের আবশ্যকীয়। দুনিয়াতে বেঁচে থেকেই আখিরাত কামাই করতে হবে। তবে দুনিয়া মানুষের জন্য একে বারেই নগণ্য বস্তু। এখানে তাকে সামান্য সময় বেঁচে থাকতে হবে। তারপর তাকে অবশ্যই তার আসল গন্তব্য আখিরাতের পথে পাড়ি দিতে হবে। দুনিয়া কারো জন্য চিরস্থায়ী নয় এবং দুনিয়াকে কেউ তাদের লক্ষ্য বানাতে পারবে না। কিন্তু দু:খের বিষয় হল, মানুষ দুনিয়ার মোহে পড়ে আখিরাত ভুলে যায়। দুনিয়া অর্জন করার জন্য রাত-দিন পরিশ্রম করে। কিন্তু আখিরাত অর্জন করার জন্য শতভাগের এক ভাগ পরিশ্রমও তারা করে না।

আল্লামা আবু জাফর আস-সাফফার রহ. বলেন, বসরার এক নারী বলল, যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত প্রবেশ করছে, তার অন্তরে তাকওয়া প্রবেশ করা হারাম[80]। যারা দুনিয়া বিমুখ হয়, তারাই সত্যিকার অর্থে পরহেজগার হয়ে থাকে। একটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, দুনিয়া ও আখিরাত একসাথে একত্র হতে পারে না। যার অন্তরে দুনিয়ার মহব্বত থাকে তার অন্তর থেকে আখিরাত দূর হয়ে যায়, আবার যার অন্তরে আখিরাতের মহব্বত থাকে তার অন্তরে দুনিয়া থাকতে পারে না।

আবু জাফর আল-মিখওয়ালী রহ. বলেন, যে অন্তর দুনিয়াকে তার সাথী বানিয়েছে সে অন্তরে তাকওয়া বা দ্বীনদারি বসবাস করা হারাম[81]।

---

[80] ইবনে আবিদ-দুনিয়া, আল-ওয়ারয়ু ২৯.

[81] তারিখে বাগদাদ: ৪১০/৪০.

অধিকাংশ মুত্তাকী বা পরহেজগার লোকদের দেখা যায়, তারা অভাবী, ফকীর, মিসকিন। এর কারণ হল,-আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের হেফাজত করুন-যারা তাকওয়া অর্জন বা দ্বীনদারি অবলম্বন করে না তারা সুদখোর, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ হরণ করে এবং হারাম হালাল বেছে চলে না। এ ধরনের লোকদের মধ্যে কাউকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের তাকওয়া অর্জন করতে দেখা যায় না। তারা সাধারণত তাদের ধন-সম্পদ ও দুনিয়াদারি নিয়েই ব্যস্ত থাকে। সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আমি যত পরহেজগার লোককে দেখেছি, তাদের সবাইকে অভাবী দেখেছি[82]। যে ব্যক্তি দুনিয়ার থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেয়, সে দ্বীনদারি অবলম্বন করতে পারবে না।

রাগ থেকে দূরে থাকা:

রাগ মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর। এটি মানুষের জীবনে অনেক বিপদ ভয়ে আনে। রাগের কারণে মানুষের জীবনে অসংখ্য দুর্ঘটনা সৃষ্টি হয়। আবু আব্দুল্লাহ আস-সাজী রহ. বলেন, যখন কোন অন্তরে রাগ প্রবেশ করে, তখন তার অন্তর থেকে তাকওয়া দূর হয়ে যায়। রাগী মানুষ যখন রাগ করে তখন সে যা ইচ্ছা তা করে ফেলে। ফলে তার মধ্যে তাকওয়া অবশিষ্ট থাকে না[83]।

---

[82] তাহজিবুল কালাম: ৩৪০/২৭.

[83] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৩১৭/৯.

কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে ধমিয়ে রাখা:

অধিক খাওয়া মানুষকে বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম করতে বাধ্য করে। কিন্তু বেশি খাওয়া মানুষের জন্য কোন কল্যাণ ভয়ে আনে না। সাথে সাথে অধিক খাওয়ারের কারণে মানুষকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আক্রান্ত হতে হয় বিভিন্ন ধরনের রোগ ব্যাধিতে। এ ছাড়া আরেকটি কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে, পেটের দায়ে মানুষ চুরি, ডাকাতি করে এবং ভিক্ষা করে, হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে। ইমাম গাজ্জালী রহ. বলেন, বুজুর্গি, দ্বীনদারি ও তাকওয়ার চাবি হল, কম খাওয়া এবং প্রবৃত্তিকে ধমিয়ে রাখা[84]।

আশাকে খাট করা:

আশা মানুষকে কর্মের দিকে ধাবিত করে। দীর্ঘ দিন বাঁচার আশায় মানুষ সঞ্চয় করে এবং ধন-সম্পদ হাসিলের অবিরাম চেষ্টা চালায়। মানুষ এত দীর্ঘ আশা করে থাকে যা তার জীবনের তুলনায় আরও বেশি লম্বা। কিন্তু দীর্ঘ আশা মানুষের জন্য কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না। বরং লম্বা ও দীর্ঘ আশা মানুষকে বিপদের দিকে নিয়ে যায়। সুতরাং আশাকে খাট করতে হবে। আজকের দিন বেঁচে আছি আগামী দিন বেঁচে থাকবো কিনা তার কোন গ্যারান্টি নাই। অধিক আশা করে কোন লাভ নাই। ইব্রাহিম ইবন আদহাম রহ. বলেন, স্বল্প লোভ-লালসা ও খাট আশা মানুষের মধ্যে সততা ও দ্বীনদারি সৃষ্টি করে[85]।

---

[84] মায়ারেজুল কুদস : ৮১.

[85] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৩৫/৮.

কথা কম বলা:

কথা কম বলা মানুষের একটি বিশেষ গুণ। যারা কথা কম বলে তারা অনেক ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে এবং তাদের মানুষ মহব্বত করে। আর যে ব্যক্তি কথা বেশি বলে মানুষ তাকে বাচাল বলে। তার দোষ-ত্রুটি বেশি মানুষের সামনে প্রকাশ পায়।

আব্দুল্লাহ ইবন আবি জাকারিয়া রহ. বলেন, যার কথা বেশি হবে তার ভুল-ভ্রান্তি বেশি হবে, আর যার ভুল-ভ্রান্তি বেশি হবে তার তাকওয়া কম হবে, আর যার তাকওয়া কম হবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার অন্তরকে নিষ্প্রাণ বানিয়ে দেবে[86]।

ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দেয়া:

ঝগড়া-বিবাদ মানুষের জন্য বিপদ ডেকে আনে। আওযায়ী রহ. হেকাম ইবন গাইলান আল-কাইসি নিকট চিঠি লিখে তাতে বলেন, তুমি ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দাও যা তোমার অন্তরকে কলুসিত করে, দুর্বলতা তৈরি করে, অন্তরকে শুকিয়ে দেয় এবং কথা ও কাজের মধ্যে তাকওয়া অবশিষ্ট থাকে না[87]।

---

[86] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৪৯.

[87] হুলিয়াতুল আওলিয়া ১৪১.

নিজের দোষ নিয়ে মাথা ঘামানো অন্যের দোষের চর্চা হতে বিরত থাকা:

যারা নিজেদের দোষ দেখে না কিন্তু অন্যদের দোষ চর্চা করতে খুব মজা পায় তারা মুনাফেক বৈ আর কিছু নয়। এ ধরনের মানুষ আমাদের সমাজে অনেক আছে, যারা মানুষের দোষ তালাশ করে বেড়ায়। কিন্তু নিজের দোষ চোখে দেখে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ ধরনের লোকদের জন্য আখিরাতে বেদনাদায়ক শাস্তি নির্ধারণ করেছেন এবং দুনিয়ার জীবনেও রয়েছে অশান্তি ও যন্ত্রণা। আমাদের নিজেদের দোষগুলো আমাদের দু চোখের অতি নিকটে। তা স্বত্বেও আমরা তা দেখতে পাই না। কিন্তু অন্যের দোষ আমার দু-চোখ থেকে অনেক দূরে। তারপরও সেগুলো আমাদের চোখের সামনে পড়ে। এটি আমাদের জন্য মারাত্মক ব্যাধি। যার চিকিৎসা অতীব জরুরি। সুতরাং আমাকে আগে আমার নিজের দোষ দেখতে হবে। তারপর অন্যের দোষ নিয়ে মাথা গামাতে হবে। আর আমি যখন কারো মধ্যে কোন দোষ দেখব, তখন তা গোপন রাখতে চেষ্টা করব। মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হতে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। কিন্তু আমি যদি দোষী ব্যক্তির সংশোধন চাই, তাহলে আগে তাকে জানাতে হবে এবং বলতে হবে আপনার মধ্যে এ দোষ আছে আপনি সংশোধন হয়ে যান। আর গোপনে তাকে উপদেশ দিয়ে বোঝাতে হবে, যাতে সে তার দোষ থেকে ফিরে আসে। ইব্রাহিম আদহমকে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল, কিসের দ্বারা তাকওয়া পরিপূর্ণ হয়? উত্তরে তিনি বললেন, তুমি তোমার গুনাহের দিকে দেখার মাধ্যমে তাকওয়ার পূর্ণতা আসবে। আর মানুষের অন্যায়ের সমালোচনা করা বা প্রচার করা হতে বিরত থাকার মাধ্যমেও তোমার মধ্যে তাকওয়া পূর্ণতা পাবে। আর যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সামনে তোমার অন্তর দুর্বল তার কথা চিন্তা করে, তুমি তোমার অন্তর থেকে খুব সুন্দর কথা

বলবে। তুমি তোমার গুনাহের বিষয়ে করনীয় সম্পর্কে চিন্তা কর এবং তোমার প্রভুর নিকট তওবা কর, তাতে তোমার অন্তরে তাকওয়া বা দ্বীনদারি প্রতিষ্ঠিত হবে[88]।

অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা হতে বিরত থাকা:

যে সব কাজ অনর্থক একজন মানুষের সময় নষ্ট করে, তা হতে বিরত থাকা অবশ্যই জরুরি। অনর্থক কাজে সময় নষ্ট করা মূর্খতা ও জাহালত। সুতরাং অর্থহীন কাজে সময় নষ্ট না করে সময়কে কাজে লাগাতে হবে। তোমার জীবন থেকে যে সময়টি চলে যাচ্ছে তা কিন্তু আর কোন দিন ফিরে আসবে না। তাই সময় নষ্ট করা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। সময় মানুষের অমূল্য সম্পদ। যে ব্যক্তি সময়কে মূল্য দিতে পারে না, সে জীবনে কিছুই হাসিল করতে পারে না। সময় হল মানুষের জীবন। যে ব্যক্তি সময়কে নষ্ট করল, সে তার জীবনকে নষ্ট করল। সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, যার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যা আদেশ করেছেন, তা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর সাথে সম্পৃক্ত হয়, সে দ্বীনদারি হতে বঞ্চিত হয়[89]। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কাজে লিপ্ত হয়, সে তাকওয়া হতে বঞ্চিত হয়[90]।

---

[88] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৬/৮.

[89] শুয়াবুল ঈমান: ৫০৫৬.

[90] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ১৯৬.

লজ্জা করা:

লজ্জা ঈমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা। যখন কোন মানুষের মধ্যে লজ্জা থাকে তা তাকে অনেক অনৈতিক ও অপকর্ম হতে বিরত রাখে। লজ্জাবোধ থাকার কারণে একজন মানুষ অসামাজিক ও অনৈতিক কোন কাজ করতে পারে না। যাদের লজ্জা থাকে সমাজে তারা সম্মানের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে যাদের লজ্জা থাকে না তারা যে কোন ধরনের অপকর্ম করতে কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা যা ইচ্ছা তা করতে পারে। মানুষের অধিকাংশ অপকর্ম সংঘটিত হয়, তার মধ্যে লজ্জাবোধ না থাকার কারণে। সুতরাং, মনে রাখতে হবে, লজ্জা দ্বীনদারি অর্জন করার গুরুত্বপূর্ণ সোপান। লজ্জা ছাড়া দ্বীনদারি কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে লজ্জা দ্বারা উদ্দেশ্য ইসলামী শরিয়ত যেসব বিষয়ে লজ্জা করতে আদেশ দিয়েছে সেসব বিষয়ে লজ্জা করা। যেমন- ব্যভিচার করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, উলঙ্গ হওয়া, বেহায়াপনা ও মদ্য পান ইত্যাদি অসামাজিক ও অনৈতিক কাজ থেকে লজ্জা করা। অনেক লোক আছে তারা ভালো কাজ করতে লজ্জা করে এ ধরনের লজ্জাকে লজ্জা বলা হয় না। যেমন, অনেকে আছে সালাম দিতে লজ্জা করে, সালাম আদায় করতে লজ্জা করে এবং বৈধ কোন কাজ করতে লজ্জা করে এ ধরনের লজ্জাকে লজ্জা বলা যাবে।

ওমর ইবনুল খাত্তাব রহ. বলেন, যার লজ্জা কম হয়, তার তাকওয়াও কম হয় আর যার তাকওয়া কম হয়, তার অন্তর মারা যায়[91]।

---

[91] তিবরানির আল-মুজামুল আওসাত: ৩৭০/২.

যখন কোন মানুষের অন্তর মারা যায়, তখন আশঙ্কা থাকে সে দুনিয়া থেকে ঈমান হারা হয়ে কবরে যাবে। আর যারা ঈমান হারা হয়ে কবরে যায় তাদের পরিণতি যে কি হবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোনটি গ্রহণযোগ্য দ্বীনদারি আর অগ্রহণযোগ্য ‘দ্বীনদারি’?

এখানে একটি কথা জানা থাকা আবশ্যক তা হল, কোন দ্বীনদারি আছে, তা বৈধ আবার কোন কোন দ্বীনদারি আছে তা অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং কোনটি বৈধ দ্বীনদারি আর কোন অবৈধ দ্বীনদারি তা আমাদের জানা থাকা দরকার। অন্যথায় সব ধরনের দ্বীনদারি অবলম্বন করতে গিয়ে বাড়াবাড়িতে পড়তে হবে।

বৈধ দ্বীনদারি:

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. বলেন, বৈধ দ্বীনদারি হল, যেসব কাজের পরিণতি আশঙ্কাজনক তার থেকে বিরত থাকা। আর আশঙ্কাজনক কাজগুলো হল, যে কাজের হারাম হওয়া বিষয়ে জানা গেছে অথবা যে কাজের হারাম কি হালাল সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। এছাড়া যেসব কাজ করার থেকে ছেড়ে দেয়াতে তেমন কোন ক্ষতি নাই, সেগুলোও আশঙ্কাজনক কাজ[92]।

পূর্বে আমরা এ ধরনের তাকওয়া বা দ্বীনদারির একাধিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি। সুতরাং, এখানে সেগুলো আলোচনা করে দীর্ঘায়িত করতে চাই না।

---

[92] মাজমুয়ে ফাতওয়া ৫১২/১০.

অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারি:

অগ্রহণযোগ্য দ্বীনদারি বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। অনেক সময় এগুলো দীনি কাজ হিসেবে আবির্ভূত হয় আবার কখনো দুনিয়াদারি হিসেবে আবির্ভূত হয়। নিম্নে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা হল।

ক- দ্বীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা:

কতক লোক আছে যারা দ্বীনদারি অবলম্বনে সীমাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে এবং তারা ইসলামী শরিয়তের মূল উদ্দেশ্য হতে বের হয়ে আসে। এটি নিতান্তই বাড়াবাড়ি ও খারাপ কাজ। কারণ, মনে রাখতে হবে, সব কিছুর একটি সীমা আছে, যখন কোন ব্যক্তি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তখন সে তার আসল উদ্দেশ্য থেকে বের হয়ে যায় এবং লক্ষ্যচ্যুত হয়। সুতরাং, মনে রাখতে হবে, কোন মানুষের জন্য দ্বীনদারি অবলম্বনে বাড়াবাড়ি করা ও সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়। যে সব মাসলা-মাসায়েল বিষয়ে মানুষ বাড়াবাড়ি করে, তার মধ্য হতে একটি মাসয়ালা; যেমন- অনেকে বলে যখন হারাম মাল হালালের সাথে মিশে, তখন হুবহু হারাম মালকে হালাল থেকে আলাদা করতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি একশ রিয়ালের মালিক হয়, তার অর্ধেক হালাল আর বাকি অর্ধেক হারাম। তখন সে যদি অর্ধেক থেকে রেহাই পেল; এ ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ কেউ বলে, নির্ধারিত হারাম- অর্ধেক- থেকে দায়মুক্তি দ্বারা সে কোন উপকৃত হতে পারবে না। এটি হল, বাড়াবাড়ি যা তাকওয়ার সীমা থেকে এক ধাপ আগ বাড়িয়ে বাড়তি তাকওয়া অবলম্বন করা হয়, যার কোন ভিত্তি শরীয়তে নাই।

যখন হালাল মাল হারামের সাথ মিশে তার বিধান কি হবে? এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কোন কোন আলেম তা থেকে গ্রহণ করাকে হারাম বলেছেন। কিন্তু যদি হারামের পরিমাণ একেবারে সামান্য হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নাই। আর ইমাম আহমদ রহ. বলেন, এ ধরনের মাল থেকে বিরত থাকা উচিত, কিন্তু যদি তা সামান্য বস্তু হয় বা উল্লেখযোগ্য কোন বস্তু না হয়ে থাকে, তাতে কোন অসুবিধা নাই[93]।

আর কোন কোন আলেম বলেন, যদি জানা যায় যে, তার মালের মধ্যে হারাম মাল রয়েছে, কিন্তু নির্দিষ্ট করে জানে না, কোন টুকু হালাল আর কোন টুকু হারাম, তাহলে তার জন্য তা হতে খাওয়ার অনুমতি রয়েছে[94]।

ইমাম যুহরী রহ. বলেন, এ ধরনের সম্পদ হতে খাওয়াতে কোন অসুবিধা নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত সে জানতে পারবে যে, নিদির্ষ্ট এ মালটি হারাম।

আর কোন কোন আলেম কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই, এ ধরনের মাল থেকে দ্বীনদারি অবলম্বন করার কথা বলেন। সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, এ ধরনের সম্পদ বক্ষণ করা আমার নিকট পছন্দনীয় নয়, আর ছেড়ে দেয়া আমার মতে অধিক প্রিয়[95]।

---

[93] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম :৭০.

[94] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম :৭০.

[95] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম ৭০.

কিন্তু যখন যে পরিমাণ হারাম তার মধ্যে প্রবেশ করছে, তা বের করে দেয়া হয়, এবং অবশিষ্ট মালকে ব্যবহার বা কাজে লাগানো হয়, তখন তা হতে বক্ষণ করা হালাল[96]।

এ অবস্থার মধ্যে নির্ধারিত হারাম মালকে বের করে আনার পর তার থেকে বেচে থাকা বা সে মালকে কোন প্রকার কাজে না লাগানো উচিত নয়। কেউ যদি একে তাকওয়া মনে করে তবে সে ভুল করবে।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ হয়, কিন্তু এ ধরনের সন্দেহের উপর ভিত্তি করে তার সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা বা তাকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। যেমন তুমি কোন একজন মুসলিম ভাইয়ের ঘরে প্রবেশ করলে যার অবস্থা সম্পর্কে তুমি কিছুই জান না। তারপর যখন তোমার সামনে সে খাওয়ার উপস্থিত করল, তখন তুমি বললে, তুমি যে টাকা দিয়ে বাজার করছ, সে টাকা কোথায় পেয়েছ? এ ধরনের জিজ্ঞাসা কোন ক্রমেই বৈধ নয়।

এ ধরনের প্রশ্ন কি তাকওয়া হতে পারে? এ ধরনের প্রশ্ন করা কোন ক্রমেই তাকওয়ার মানদণ্ডে পড়ে না। বরং এ ধরনের প্রশ্নের মধ্যে একজন মুসলিমকে কষ্ট দেয়া ও লজ্জা দেয়া হয়।

কারণ, এ হল তাকে অপবাদ দেয়া এবং তার প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা। কোন মুসলিমকে কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ও আলামত ছাড়া অপবাদ দেয়া এবং তাকে সন্দেহের তালিকায় রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ।

---

[96] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম ৭০.

আর এ হল, একজন মুসলিমের প্রতি খারাপ ধারণা করা এবং একজন মুসলিমের জন্য তার অপর মুসলিম ভাইকে কষ্ট দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।

খ- কু-মন্ত্রণা বা ওয়াসওয়াসা:

এখানে কিছু বিষয় আছে যেগুলোর প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা বা গুরুত্ব দেয়া কোন ক্রমেই উচিত নয়। এগুলোকে তাকওয়া বলা চলে না; বরং এগুলোকে কু-মন্ত্রণা বলা হয়। এর দৃষ্টান্ত হল, আল্লামা ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে উল্লেখ করেন, কোন কোন লোক এমন আছে তারা শিকার করা পাখি খায় না, তারা আশঙ্কা করে, শিকারিটি কোন মানুষের ছিল, তারপর সে তার মালিক থেকে পালিয়ে গেছে, তাই সে চিন্তা করে মালিকের অনুমতি ছাড়া তা হতে খাওয়া যাবে না।

অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় বস্তু কোন অপরিচিত লোক থেকে ক্রয় করে তা খায় না। তার যুক্তি হল, তা কি হালাল না হারাম তা সে জানে না। অথচ এখানে এমন কোন প্রমাণ নাই যা এ কথা প্রমাণ করে যে, বস্তুটি হারাম। কোন প্রকার দলীল প্রমাণ ছাড়া কোন কিছু খাওয়া বা গ্রহণ করা হতে বিরত থাকা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামের মূলনীতি হল, প্রতিটি বস্তুর আসল প্রকৃতি হল, হালাল হওয়া। যদি হারাম হওয়ার কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। আর যদি হারাম হওয়া প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন তাকে হারাম বলা যাবে। অন্যথায় তাকে হারাম বলা হারাম।

ওয়াসওয়াসার অপর একটি দৃষ্টান্ত:

আল্লামা যারকশী রহ. বলেন, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে বলে, সে তার স্ত্রীর কাপড় পরিধান করবে না। এরপর স্ত্রী তার কাপড়টি বিক্রি করে দিল এবং বিক্রয় মূল্যটি তার স্বামীকে দান করল, তখন তার জন্য তা খাওয়াতে কোন অসুবিধা নাই। কারণ, তা ব্যবহার করা ছেড়ে দেয়া কোন দ্বীনদারি নয়, বরং তা হল, ওয়াসওয়াসা।

বিশেষ দ্বীনদারি

সাধারণ মানুষের দ্বীনদারি আর বিশেষ মানুষের দ্বীনদারি এক হতে পারে না। কিছু কিছু বিষয়ে দ্বীনদারি আছে যেগুলো শুধু বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সবার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। এ ধরনের দ্বীনদারিকে সূক্ষ্ম বা খাস দ্বীনদারি বলা হয়, যা সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ কিছু লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আল্লামা ইবন রজব রহ. বলেন, এখানে একটি বিষয় আছে, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া একান্ত জরুরি। আর তা হল, সন্দেহযুক্ত বস্তু থেকে বিরত থাকা তার জন্য মানায়, যার যাবতীয় সব অবস্থা স্থির এবং তার আমলসমূহ তাকওয়া ও দ্বীনদারির ক্ষেত্রে একটি অপরটির পরিপূরক। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে হারামে লিপ্ত হয়, তারপর সে সূক্ষ্ম বস্তু বা সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে দ্বীনদারি অবলম্বন করে, তার জন্য এ ধরনের তাকওয়া বা দ্বীনদারি মানায় না। তার ক্ষেত্রে এ ধরনের দ্বীনদারি কোন ক্রমেই প্রযোজ্য নয় বরং তাকে এ ধরনের দ্বীনদারি অবলম্বন থেকে বিরত রাখাই বাঞ্ছনীয়।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে ইরাকের এক অধিবাসী ব্যাঙের প্রস্রাবের বিধান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে তিনি বলেন, তারা আমাকে ব্যাঙের পেশাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে, অথচ তারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু 'আনহুকে হত্যা করছে। আর আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

« هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا»

দুনিয়াতে তারা উভয় আমার দুই বাহু[97]।

ইমাম আহমাদ ইবন হাম্বল রহ. কে জিজ্ঞাসা করা হল, একজন লোক সবজি কেনার সময় শর্ত দিয়ে বলল, আমি তোমার থেকে সবজি এ শর্তে ক্রয় করতে পারি, তুমি আমাকে একটি দড়ি দেবে যার দ্বারা আমি আমার সবজিগুলো বেধে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি। ইমাম আহমদ রহ. তার কথা শুনে বলল, এ ধরনের কাজ কে করে? তখন তাকে জানানো হল, ইব্রাহীম ইবনে আবি নুয়াইম এ ধরনের কাজ করে থাকে। তখন তিনি বললেন, যদি ইব্রাহীম ইবন আমি নুয়াইম এ ধরনের কাজ করে থাকে তবে তা বৈধ। কারণ, দড়িটি সবজির সাথে সম্পৃক্ত[98]।

মোট কথা: কোন জিনিষ থেকে বিরত থাকবো আর কোন জিনিষ থেকে বিরত থাকবো না ব্যক্তির অবস্থার উপর নির্ভর করে। মানুষ যখন পরিস্থিতির স্বীকার হয় তখন পরিস্থিতির আলোকে সিদ্ধান্ত নেয়াই হল, তাকওয়া বা দ্বীনদারি। একজন খাদ্যের অভাবে মারা যাচ্ছে, তখন তার জন্য মৃত জন্তু খাওয়াও বৈধ। তার জান বাঁচানোর জন্য তখন হারাম বলে তা থেকে বিরত থাকা দ্বীনদারি নয়, তা খাওয়াই হল, দ্বীনদারি। যে ব্যক্তি ফরজ সালাত আদায় থেকে বিরত থাকে তার জন্য নফল সালাত কোন বুজুর্গি নয়। অনেক লোক এমন আছে যারা রমজানের রোজা রাখে না কিন্তু শাওয়ালের রোজা নিয়ে টানাটানি করে এটা কোন বুজুর্গি নয়। এগুলো নিছক ভন্ডামী ও পাগলামি বৈ কিছু নয়। কিছু কিছু বিষয় আছে এত সূক্ষ্ম যার থেকে বেচে থাকা কারো ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। বরং যারা এ সব থেকে বেচে থাকতে চায়, তারা যদি ফাসেক বা সুযোগ

---

[97] বুখারি :৫৬৪৮.

[98] জামেয়ুল উলুম ওয়াল হিকাম: ১১১.

সন্ধানী লোক হয়, তাদেরকে তা হতে বিরত রাখতে হবে এবং তাদের প্রতিহত করতে হবে।

পরিশিষ্ট

পরিশেষে আমরা বলব তাকওয়া অর্জন করার মধ্যে নিহিত রয়েছে দুনিয়া ও আখিরাতের কামিয়াবি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। যারা আল্লাহর আদেশ নিষেধের তোয়াক্কা করে না তারা দুনিয়াতেও অশান্তিতে থাকবে এবং আখেরাতেও তারা বঞ্চিত হবে। একজন মানুষের জন্য দ্বীনদারি বা তাকওয়া ছেড়ে দেয়ার মধ্যে তার দ্বীন ও দুনিয়ার অনেক ক্ষতি নিহিত। আর এর প্রভাব খুবই মারাত্মক ও ধ্বংসাত্মক। আর যখন একজন মানুষের মধ্যে দ্বীনদারি থাকবে তখন তার অনেক পেরেশানি দূর হবে। কোন প্রকার হতাশা ও দুশ্চিন্তা তাকে গ্রাস করতে পারবে না। তার উপর যত মুসীবতই আসুক না কেন, তা সে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে। সে তার সমস্ত বিপদ-আপদকে তার জন্য পরীক্ষামুলক হিসেবে গ্রহণ করবে। সাহল ইবনে আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, যখন কোন বান্দা দ্বীনদারি অবলম্বন না করে এবং আমল করার ক্ষেত্রে সে দ্বীনদারিকে কাজে না লাগায়, তখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো গুনাহের কাজে জড়িয়ে পড়ে। আর ধীরে ধীরে তার অন্তর শয়তানের হাতে বা কব্জায় চলে যায়। তখন তার থেকে বের হয়ে আসা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে[99]।

অনেক সময় দেখা যায়, একজন মানুষ তাকওয়া বা দ্বীনদারি অবলম্বন না করার কারণে তার আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যায় এবং তার আমল কোন কাজে আসে না।

---

[99] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ২০৫/১০.

ইয়াছ ইবন মুয়াবিয়া রহ. বলেন, যে দ্বীনদারি দ্বীনদারি ও তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়, তা অবশ্যই অনর্থক[100]। তার কোন মূল্য নাই। আর যে দ্বীনদারি দ্বীনদারি বা তাকওয়ার ভিত্তিতে হয়, তা তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, তাকওয়া ছেড়ে দেয়া উম্মতে মুসলিমাকে ধ্বংস করে দেয়। আর তাকওয়া ছেড়ে দেয়া মুসলিম উম্মতের ভাল কাজগুলোকে স্ব-মূলে উৎখাত করার কারণ হয়। সাহাল ইবন আব্দুল্লাহ রহ. বলেন, দ্বীনদারি ছেড়ে দেয়ার কারণে মানুষের মধ্যে এমন কিছু বিষয় প্রকাশ পাবে যা মানুষের বিনয়কে মানুষ থেকে তুলে নেবে।

একটি কথা মনে রাখতে হবে, দ্বীনদারি কোন দাবি করা বা জোর করে সাব্যস্ত করার বিষয় নয়, যে একজন ব্যক্তি জোর করে বা দাবি করে পরহেজগার হতে পারবে। বরং তা অর্জন করার জন্য আমল করতে হবে এবং সাধনা করতে হবে। যখন একজন মানুষ চেষ্টা ও সাধনা করবে তখন তার অন্তরে তাকওয়া ও দ্বীনদারি স্থাপিত হবে। যারা নিজেকে পরহেজগার বা মুত্তাকী দাবি করে তারা সত্যিকার অর্থে মুত্তাকী বা পরহেজগার নয়। তারা দুনিয়াদার ও ভন্ড।

যারা হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকে না এবং হারাম হালাল বেছে থাকে না, তাদের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এর মহব্বতের দাবি করা মিথ্যা বৈই আর কিছুই নয়। হাতেম রহ. বলেন,

---

[100] তাহজীবুল কামাল: ৪১৩/৩

যে ব্যক্তি হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত না থাকে, সে অবশ্যই মিথ্যুক[101]।

একজন মুসলিমের জন্য উচিত হল, তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য যেন হয়, দ্বীনের বিষয়ে তাকওয়া অবলম্বন করা, আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ভয়কে কাজে লাগানো এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ ও নিষেধ বিষয়ে সব সময় আল্লাহ রাব্বুল আলমীনকে তার নিকটে বলে জানা।

وَوَاظْب عَلَى التَّقْوَى وَكُنْ مُتَوَّرعاً

صُبوراً عَلى البَلْوى وَبِالدِّينِ كُنْ شْهمَا

"তুমি সব সময় আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং তুমি পরহেজগার হও। বিপদে তুমি ধৈর্য্যশীল থাক এবং দ্বীনের বিষয়ে তুমি বিচক্ষণ হও"[102]।

অবশেষে আমরা বলব, সু-সংবাদ সে ব্যক্তির জন্য যার অন্তরের মধ্যে দ্বীনদারি পরিলক্ষিত হবে। যারা পরহেজগার হবে দুনিয়াতে তাদের জন্য রয়েছে কামিয়াবি আর আখিরাতে থাকবে অনাবিল আনন্দ।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুত্তাকী বা পরহেজগার বানিয়ে দাও এবং আমাদেরকে যাবতীয় কাজে হেদায়েত দান কর। আর তাকওয়াকে

---

[101] হুলিয়াতুল আওলিয়া: ৭৫/৮.

[102] আত-তারিফ: ৮৫.

আমাদের পাথেয় বানাও এবং জান্নাতকে আমাদের গন্তব্য-স্থল বানাও। আর আমাদেরকে তুমি এমন শুকরিয়া আদায় করার তাওফিক দান কর, যা তোমাকে খুশি করে। আর তুমি আমাদেরকে এমন দ্বীনদারি দান কর, যা আমাদেরকে তোমার নাফরমানির মাঝে দেয়াল হিসেবে বিবেচিত হয়। আর তুমি আমাদের এমন চরিত্র দান কর, যা দ্বারা আমরা মানুষের মাঝে ভালোভাবে বাচতে পারি। আর আমাদের তুমি এমন জ্ঞান দান কর যদ্বারা আমরা উপকৃত হতে পারি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের হেদায়েত প্রাপ্ত লোকদের পথ প্রদর্শক বানান। আপনি আমাদের পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না। আর আপনি আমাদের সবার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন। আর যাবতীয় প্রশংসা তার জন্য যার অপার অনুগ্রহে যাবতীয় নেক আমলসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে।

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

অনুশীলনী

তোমার সামনে দুই ধরনের প্রশ্ন পেশ করা হল, এক ধরনের প্রশ্ন যে গুলোর উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে। আর এক ধরনের প্রশ্নের উত্তর তুমি সাথে সাথে দিতে পারবে না, বরং তোমাকে একটু চিন্তাভাবনা করে উত্তর দিতে হবে।

প্রথম প্রকার প্রশ্ন:

১. যে দ্বীনদারি অবলম্বন করা ওয়াজিব তা কি?

২ দ্বীনদারির চারটি স্তর আছে, সে গুলো কি তা উল্লেখ কর! এবং প্রতিটি স্তরের সংজ্ঞা উল্লেখ কর।

৩. দ্বীনদারি অবলম্বনের ফজিলতের উপর তিনটি হাদিস উল্লেখ কর।

৪. বিচার কাজে দ্বীনদারি থাকা শর্ত। এ শর্তটি কি কারণে আরোপ করা হয়ে থাকে।

৫. সালেহীনদের তাকওয়ার তিনটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

৬. দ্বীনদারি অবলম্বনের পাঁচটি ফায়েদা আলোচনা কর।

৭. দ্বীনদারি অবলম্বনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কি তা আলোচনা কর। এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

৮. ইমাম ইবনুল কাইয়ুম রহ. দ্বীনদারির যে সংজ্ঞা দেন, তা কি? আলোচনা কর।

৯. তাকওয়ার ক্ষেত্রে মানুষের যে প্রকারভেদ আছে তা আলোচনা কর।

১০. ওয়াসওয়াসা অবলম্বনকারীদের ওয়াসওয়াসা বিষয়ে দুটি দৃষ্টান্ত আলোচনা কর।

দ্বিতীয় প্রকার প্রশ্ন:

১- দ্বীনদারির হাকীকত কি?

২- ঝগড়া-বিবাদ ছেড়ে দেয়া কিভাবে তাকওয়া অবলম্বনের কারণ হতে পারে?

৩- দ্বীনদারি অবলম্বন করা সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ হতে বিরত রাখার কারণ হয়ে থাকে। বিষয়টি আরও স্পষ্ট করে আলোচনা করুন।

৪- উপরে উল্লেখিত কারণগুলো ছাড়া এমন কিছু কারণ উল্লেখ কর যেগুলো অবলম্বন দ্বারা তাকওয়া অর্জন হয়।

৫- কিছু কিতাবের নাম উল্লেখ কর, যেগুলোতে দ্বীনদারি বিষয়ে আলোচনা করাকে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে।

৬. একটি ঘটনা উল্লেখ কর, যা প্রমাণ করে যে দ্বীনদারি যেভাবে প্রকাশ্যে হয় এভাবে গোপনেও হয়ে থাকে।

৭. একজন মুসলিমের জন্য শুধু অন্তরের তাকওয়া যথেষ্ট কিনা? বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা কর।

সূচীপত্র